ঈমান ও ইসলাম

WWW.ALQURANS.COM

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তি, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়্যিদুনা তাহের আলাউদ্দীন আলকাদেরী আলবাগদাদী (রহ.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য় অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী, মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলুভী আল-মালেকী আল-মক্কী (রহ.)-এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদ আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মেডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিক্‌হ্ উপদেষ্টা, পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা, ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য, আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের সহসভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ'-এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি, লাহোর'।

উর্দু, আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিতমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে। মানবকল্যাণের কারণ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সমাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইউস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের উপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল বায়ুগ্রাফিক্যাল সেন্টার অব কেন্দ্রিক (IBC)-এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বাব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব-এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who-এর পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI)-এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সনজরী পাবলিকেশন

ایمان اور اسلام

ঈমান ও ইসলাম

মূল

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী

সম্পাদনা

আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

অনুবাদ

উবাইদুল্লাহ মুহাম্মদ আশরাফ

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

সনৃজরী পাবলিকেশন

১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.alqurans.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

ঈমান ও ইসলাম
মূল : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আল-কাদেরী
ভাষান্তর : উবাইদুল্লা মুহাম্মদ আশরাফ
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ২০ জুন- ২০১০, ৭ রজব- ১৪৩১, ৬ আষাঢ়- ১৪১৬

মূল্য : ১৬০ [একশত ষাট] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Iman & Islam, By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated By: Obaidullah Muhammad Asrhaf. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 160/-

www.alqurans.com

সূচিপত্র

ঈমান ও ইসলাম

প্রথম অধ্যায় ১
ঈমান ও ইসলাম ১
ঈমান শব্দের আভিধানিক ধারণা ১
সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে ঈমান শব্দের অর্থ ২
হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের আমানতের দাবি ৪
অব্যয় যোগে ঈমান শব্দের ব্যবহার ৫
পূর্বোক্ত আলোচনার সারকথা ৬
أَمْنٌ মূল ধাতু থেকে মুমিনের পারিভাষিক ভাব ৬
আমানত অর্থে মুমিনের ভাবার্থ ৭
ঈমানের বাস্তবতা ৭
ঈমানের তিনটি স্তর ৮
১ - ইলম বা জ্ঞান ৮
পূর্ববর্তী নবীগণ ও জগতের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী পদ্ধতিতে পার্থক্য ৯
২ - ইরফান বা আল্লাহর মারেফত ১১
৩ - ইকান বা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ১৩
হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা ১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮
মুমিন এবং তার বৈশিষ্ট্য ১৮
মুমিনের সংজ্ঞা ১৯
আরবী শব্দ 'إِنَّمَا' এর ব্যবহার ১৯
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান ২০
সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে থাকা ২০
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাস্তায় জান-মাল খরচ করে জিহাদ ২১
জান-মাল খরচ করে জিহাদ কেন? ২২
বিশ্বাসে হ্রাস-বৃদ্ধি ২২
মানুষের প্রচেষ্টা-উদ্যোগের উদ্দেশ্য ২৪
আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার অর্থ ২৫
মুমিনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য ২৬
১. নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য ২৭
সন্ত্রাস-দুর্নীতির মূলোৎপাটন ২৮
২. ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ২৯
ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার আবেগ ২৯
ঐক্য ৩০
আত্মবিসর্জন ৩১
তৃতীয় অধ্যায় ৩৮
ঈমানের আদব ৩৮
ঈমানী দাওয়াতের দর্শন ৩৯
ঈমানের তিনটি আদব ৩৯
প্রথম আদব ৩৯
দ্বিতীয় আদব ৪০
তৃতীয় আদব ৪০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারিদ্র : ঈমানের উৎস ৪০
ঈমানের পরিচয় ৪১
কোরআন এবং ঈমানের আদব ৪২
মানুষের জীবন-মরণ মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত ৪২
"مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" এর ভাবার্থ ৪৩
দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে তারতম্য ৪৪
দ্বীনের বিভিন্ন শাখা ৪৫
আকাইদ শাস্ত্র ৪৫
শিষ্টাচারগত বিধানাবলী ৪৫
বিবাহ সম্পর্কিত বিধানাবলী ৪৬
ধন-সম্পদ সম্পর্কিত বিধানাবলী ৪৬
চুক্তি-মৈত্রী সম্পর্কিত বিধানাবলী ৪৬
শাস্তি সম্পর্কিত বিধানাবলী ৪৬
রাজত্ব সম্পর্কিত বিধানাবলী ৪৬
প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধানাবলী ৪৬
অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিধানাবলী ৪৭
ধর্ম, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখাকে অন্তর্ভূক্ত করে ৪৭
অনৈসলামিক জীবনের দুঃখজনক ঘটনা ৪৭
বাতিল রীতি-নীতি পরিত্যাগ ৪৮
ঈমানের মাপকাঠি ৪৯
হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর এক আলোকময় বিজ্ঞতার কাহিনী ৫১
উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়ের মধ্যে পার্থক্য ৫৩
হাদীসে কুদ্সী ৫৪

www.alqurans.com

সকল অশ্লীলতা ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ঈমানের পরিপন্থী ৫৫
যাহির–বাতিনের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ৫৬
কোরআন–সুন্নাহ্ চারিত্রিক এবং ধর্মীয় আইনের উৎস ৫৭
চারিত্রিক অধঃপতন এবং পাশ্চাত্য ৫৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নতের প্রতি আগ্রহী হবার অপরিহার্যতা ৫৯
ঈমানের দ্বিতীয় আদবের দাবি ৫৯
তাবলিগী তৎপরতা ফলপ্রসু নয় কেন? ৬০
মুমিনের ইহকালীন সফলতার খোদায়ী জিম্মাদারি ৬১
দুনিয়া–আখিরাতে সফলতা ৬২
শর্তহীন ভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুকরণই মুক্তির পথ ৬৩
কোরআনী আদেশের মৌলিক প্রেক্ষাপট ৬৪
অন্তর এবং নিয়তের অবস্থা ভালই আল্লাহ্ জানেন ৬৫
শেষ কথা ৬৬
চতুর্থ অধ্যায় ৬৮
ঈমান ও অবিচলতা ৬৮
আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার দাবি ৬৯
চৈন্তিক মুহূর্ত ৭০
বিপদে কৃতকার্যতা ৭০
অবিচলতা যাচাইয়ের পাঁচটি মূলনীতি ৭১
এক. ভয়–ভীতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা ৭২
দুই. ক্ষুধার মাধ্যমে পরীক্ষা করা ৭২
তিন. ধন–সম্পদ পতনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা ৭২
চার. জান ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করা ৭২
পাঁচ. ফল–ফলাদি পতনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা ৭৩
পুরো জীবনই পরীক্ষা ৭৩
ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যম পন্থাই সঠিক পথ ৭৩
ঈমানের মাপকাঠি ৭৪
সচ্ছলতা–দরিদ্রতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌রের নির্দেশ ৭৪
অবিচলতার ফসল ৭৬
মকবুল বান্দাগণ সম্পর্কে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করো না ৭৬
সারকথা ৮১
পঞ্চম অধ্যায় ৮২
ইসলাম ও তার প্রকৃতি ৮২
সূচনা ৮২
হাদীসে জিবরাঈল ৮২
দ্বীনের তিনটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ৮৪
ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের বিষয়বস্তু ৮৪
ইসলাম শব্দের মর্মার্থ ৮৬
পারিভাষিক অর্থের উপর প্রথম আভিধানিক অর্থের প্রভাব ৮৯
০১. ইসলামের পারিভাষিক অর্থের উপর শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রভাব ৮৯
ক. অকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে ইসলামের অর্থ ৮৯
খ. সকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে ইসলামের অর্থ ৮৯
মক্কা বিজয়কালে শান্তি এবং স্বাধীনতার ঘোষণা ৯১
রাসূলের বাণী ৯২
'ইসলাম' অর্থের ইতিবাচক দিক ৯৪
২. পারিভাষিক অর্থের উপর দ্বিতীয় আভিধানিক অর্থের প্রভাব ৯৫
শানে নুযুল ৯৭
৩. পারিভাষিক অর্থের উপর তৃতীয় আভিধানিক অর্থের প্রভাব ৯৯
যুদ্ধাবস্থায়ও সন্ধি প্রিয়তার নমুনা ৯৯
আমর বিন আবদেউদকে ইসলামের দাওয়াত ১০১
"هَلاَّ شَقَقْتَ قَلْبَهُ" কালেমা উচ্চারণকারীকে হত্যা করা জায়েয নেই ১০১
বিধানের অকার্যকরিতা ও এর প্রেক্ষাপট ১০২
সন্ধি এবং মুনাফেকীর মধ্যে পার্থক্য ১০৪
ভালো–মন্দের মধ্যে বৈপরিত্য ১০৫
আকাবার দ্বিতীয় বায়আত সম্পর্কে হযরত সা'আদ বিন উবাদা রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা ১০৭
ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে, নাকি কীর্তির জোরে ১০৭
০৪. ইসলামের পারিভাষিক অর্থে চতুর্থ আভিধানিক অর্থের প্রভাব ১০৯
সারকথা ১১২

প্রকাশকের বক্তব্য

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসলমানের প্রাণ হচ্ছে ঈমান। প্রাণ ছাড়া যেমন গোটা শরীর অচল, ঈমান ছাড়া মুসলমানিত্ব তদ্রুপ অর্থহীন। ঈমান ছাড়া একজন মুসলমানের অস্তিত্ব হচ্ছে পানির ওপর ভাসমান শিকড়হীন শ্যাওলার ন্যায়। একজন সত্যিকার মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য ঈমানের বিকল্প নেই। বিকল্প নেই ইসলামের। ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় ক্ষেত্রবিশেষ সমার্থক হলেও পরস্পর পৃথক অর্থের অবকাশ রাখে। আমরা মুমিন ও মুসলিম হওয়ার দাবীদার। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক ঈমান-ইসলামের অর্থ প্রকৃতি, বাস্তবতা ও দাবীর ব্যাপারে অজ্ঞ। বিষয়গুলো অজ্ঞাত থাকার কারণে আমাদের ঈমানের দাবী কতটুকু বাস্তবসম্মত, তা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? এই অজ্ঞতার কারণে আমরা আমাদের যাবতীয় কর্মকান্ডে সৃষ্টি করেছি বিভাজন। শুধু নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদিকে ইবাদত মনে করে অবশিষ্ট কাজকর্ম ও লেনদেনকে পার্থিব কাজ বলে চালিয়ে দিচ্ছি। অথচ ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। এখানে মসজিদের বাইরে-ভিতরের সকল কাজ ইবাদত বিধায় সবগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে। পার্থিব অপার্থিব বিভাজন আমাদেরকে যে মুনাফেকির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আমরা কতটুকু ওয়াকিফহাল? আলোচ্য বইয়ে এসব কিছুর উত্তর পাওয়া যাবে।

শায়খুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী রচিত "ایمان اور اسلام" নামক বইটি এ বিষয়ে নির্যাস বলে মনে করি। বইটি আমাদের নিকট খুবই পছন্দ হওয়ার কারণে অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মূল আবেদন রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। তবে এ বিষয়ে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ক্রটি অবহিত করলে আগামী সংস্করণে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

সালামসহ
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.alqurans.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

প্রথম অধ্যায়

ঈমান ও ইসলাম

ঈমান মুমিনদের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। একজন খাঁটি মুমিন সবকিছু বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু কখনো সে ঈমান হাতছাড়া করার জন্য প্রস্তুত থাকে না। আর ঈমান যখন তার কাছে অতি প্রিয় হয়ে যায় তখন কুফর তার অন্তরে স্থান পেতে পারে না। পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়া তার জন্য তখন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন নাফরমানী তার কাছ থেকে তখন প্রকাশ পায় না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ﴿٧﴾

"জেনে রেখো ! তোমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অধিকাংশ বিষয়ে যদি তিনি তোমাদের কথা মতো চলেন, তবে তোমরা সমস্যায় পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ ঈমানকেই তোমাদের পছন্দের বস্তু বানিয়েছেন। সেটিকে তোমাদের অন্তরে সুসজ্জিত করে রেখেছেন। আর কুফর, পাপাচার ও নাফরমানিকে বানিয়েছেন তোমাদের অপছন্দনীয় বিষয়। এঁরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।"[১]

উপর্যুক্ত আয়াতে হেদায়তের পথের পথিকদের জন্য ঈমানকে পছন্দনীয় বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া এবং এর ফলশ্রুতিতে পাপাচার ও গুনাহ্কে তাদের কাছে অপছন্দনীয় বিষয় হিসেবে ধারণা দেওয়ার যে খোদায়ী এলান ঘোষিত হয়েছে, এর ধরণ, রূপ, প্রকার ইত্যাদি সম্পর্কে অবগতি লাভ করার জন্য ঈমানের হাকীকত ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব জরুরী একটি বিষয়।

ঈমান শব্দের আভিধানিক ধারণা

ঈমান শব্দটি আরবী। এটি ن – م – أ বা "أَمَنَ" শব্দমূল থেকে নির্গত। ভয়-ভীতি মুক্ত হওয়া, অন্তরে প্রশান্তি লাভ হওয়া, সুখ-শান্তির মতো দৌলতের মালিক হওয়া ইত্যাদি ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ।

---

১. সূরা হুজুরাত ৪৯:৭৯

www.alqurans.com

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে "ঈমান" শব্দের অর্থ

(আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী) ঈমান শব্দটি সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া, [১] এ দু'ভাবেই ব্যবহৃত হয়। অকর্মক ক্রিয়া অনুযায়ী এর অর্থ হলো, নিরাপত্তা পাওয়া। এ দৃষ্টিকোণে ঈমান শব্দটি কোন মানুষ নিরাপত্তা পাওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে, সকর্মক ক্রিয়া অনুযায়ী শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে, অন্যকে নিরাপত্তা কিংবা সুস্থতা দান করা। অতএব, নিরাপত্তা পাওয়া এবং নিরাপত্তা দেওয়া উভয়কেই ঈমান বলা হয়।

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে একটি মোবারক নাম হলো মুমিন। তাই এক্ষেত্রে মুমিন বলতে ঐ সত্ত্বাকে বুঝানো হয়, যিনি তাঁর মহিমান্বিত আঁচলের সাথে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদেরকে নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করেন।

এর বিপরীতে মানব জাতির ক্ষেত্রে মুমিন সে সব ভাগ্যবান ব্যক্তিদের বলা হয়, যাঁরা মহান আল্লাহর সত্ত্বার সাথে আপনকে জড়িয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন। মুমিন শব্দের উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিন শব্দটি মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে শুধু সকর্মক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়, আর মানব জাতির বিশেষ একটি দলের ক্ষেত্রে শব্দটি সকর্মক ও অকর্মক উভয় ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতে সকর্মক ক্রিয়ার অর্থে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ত্রিশতম পারায় মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

"(এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে) মানুষের উচিত, তারা যেন এ ঘরের মালিকের (আল্লাহর) ইবাদত করে, যিনি তাদের জন্য ক্ষুধার সময় আহারের ব্যবস্থা করেছেন, এবং ভয়-ভীতি ও আতঙ্ককালীন সময়ে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।"[২]

---

১. দেখুন রাগেব ইসফাহানীর মুফরাদাতুল কোরআন, পৃ. ৬৭-৬৮ লাহোর হতে প্রকাশিত। متعدی (সকর্মক) ও غیر متعدی (অকর্মক) আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ পরিভাষা। যার মূল কথা এই যে, কিছু ক্রিয়া এ ধরনের, যেগুলো কর্তা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সেগুলো কর্মের প্রয়োজন অনুভব করেনা। যেমন- বলা হল, "সে এসেছে" এ ধরনের ক্রিয়াকে লাযেম বা অকর্মক বলা হয়। পক্ষান্তরে কিছু কিছু ক্রিয়া কর্তার সাথে সাথে কর্মের প্রয়োজনও অনুভব করে। অর্থাৎ এই সকল ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য কর্তা হতে স্থানান্তরিত হয়ে অন্যের নিকট পৌঁছা। এরূপ ক্রিয়াকে متعدی (সকর্মক) বলা হয়। তাই সংক্রামক ব্যাধিকেও متعدی (সকর্মক) বলা হয়।

২. সূরা কুরাইশ ১০৬:৩-৪

অর্থাৎ, সে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষুধার জ্বালা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে জীবিকা ও আহার দান করেছেন। অনাহার-নিঃস্বতা থেকে মুক্তি দিয়ে চাহিদা মতো খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে ভরে দিয়েছেন। দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে উদ্ধার করে নেয়ামতরাজিতে ভরপুর করে দিয়েছেন। শংকা, ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিরাপত্তা ও সুস্থতার নেয়ামত ঢেলে দিয়েছেন। ইবাদত ও উপাসনা তাঁরই জন্য উপযুক্ত।

তেমনিভাবে কোরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে এ শব্দটি অকর্মক ক্রিয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

"অতঃপর যখন তোমাদের অন্তরের পরিতুষ্টি (নিরাপত্তা) অর্জিত হবে, তোমরা আল্লাহর শিখানো পন্থায় তাঁকে স্মরণ (তাঁর যিকির) করো, যে পন্থা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।"[১]

লক্ষ্যণীয় যে, এ আয়াতের পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে যুদ্ধ এবং শংকার কথা বর্ণনা করা হচ্ছিল। বর্ণনাটি এই, যুদ্ধ এবং শংকার মতো নাজুক পরিস্থিতিতেও নামায ছেড়ে দেয়া যাবে না। এমনকি (যুদ্ধের ক্ষেত্রে) পদাতিক অবস্থায় কিংবা চলন্ত যানবাহনে থাকলেও তোমরা সে অবস্থায়ই নামায পড়ে নাও।[২]

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তোমরা ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থাকবে এবং যে কোন শংকা থেকে তোমরা নিরাপদে থাকবে, তখন আল্লাহর শিখানো পন্থায় তোমরা তাঁর যিকিরে মগ্ন হয়ে যাও।

এখানে أَمِنتُمْ শব্দটি অকর্মক ক্রিয়া তথা "নিরাপত্তা পাওয়া" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা প্রমাণ হলো যে, ঈমান এর মূল শব্দের ব্যবহার সকর্মক ক্রিয়ার অর্থে হলে এর অর্থ দাঁড়াবে অন্যকে নিরাপত্তা দেয়া, এবং অকর্মক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহার হলে এর অর্থ দাঁড়াবে স্বয়ং নিরাপত্তা পাওয়া।

---

১. সূরা বাকারা ২:২৩৯

২. আহনাফের মতে, মুসাফিরকে এ অনুমতিও দেয়া হয়েছে যে, সে সওয়ারির ওপর নফল নামায পড়তে পারবে। তার মুখ যে দিকে হোক না কেন। এমতাবস্থায় কিবলামুখী হওয়া এবং দণ্ডায়মান হওয়ার শর্ত হতে তাকে আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। তবে ফরজ ও ওয়াজিব নামাযের ক্ষেত্রে সওয়ারি হতে অবতরণ করা, দণ্ডায়মান হওয়া এবং কিবলামুখী হয়ে নামায পড়া অবশ্যক। (হেদায়া ১:১৩৩) ইমাম আবু হানিফার মতে, ফজরের নামাযের সুন্নাতও নিচে অবতরণ করে পড়া উচিত।

www.alqurans.com

ঈমান শব্দে আমানতের অর্থও রয়েছে। কেননা, আমানত শব্দটিও আরবী أَمْنٌ শব্দমূল থেকে নির্গত। একই ভাবে أَمِيْنٌ শব্দটিও আরবী أَمْنٌ শব্দমূল থেকে নির্গত। আরবী أَمِيْنٌ শব্দের অর্থ হলো, "যে ব্যক্তির উপর অন্যদের আস্থা থাকে"। এক কথায় আস্থাশীল বা বিশ্বাসী ব্যক্তিকে أَمِيْنٌ বলা হয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ﴿٢٨٣﴾

"তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্যের কাছে আমানত স্বরূপ কোন কিছু গচ্ছিত রাখে, তবে আমানত রক্ষাকারীর উচিত, সে যেন আমানতের অর্থ-সম্পদ আমানতকারীকে ফিরিয়ে দেয়।"[১]

আমানতের আবশ্যকীয় চাহিদা হলো, আস্থা আর বিশ্বাস। এ কারণে যে ব্যক্তির কাছে আমানতের অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখা হবে, তাকে আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতীক হতে হবে। আস্থাহীন এবং বিশ্বাস নির্ভর নয় এমন ব্যক্তিকে আমীন বা বিশ্বাসী বলা যেতে পারে না।

এ বিশ্লেষণের আলোকে উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে, "যদি তোমাদের কেউ অন্যের উপর আস্থাশীল হয়ে কোন মূল্যবান অর্থ-সম্পদ তার কাছে আমানত স্বরূপ গচ্ছিত রাখে; আপন মালিকানাধীন কোন বস্তু তার কাছে সোপর্দ করে, তবে সে যেন তার আস্থাকে অসম্মান না করে। আমানত রাখতে গিয়ে আমানত রক্ষাকারীর পক্ষ থেকে আমানত কারী যেন কোন ধরণের ভয়-ভীতি বা শঙ্কা অনুভব না করেন।

যাই হোক, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা সাব্যস্ত হলো যে, أَمْنٌ এবং এ শব্দ থেকে নির্গত যে কোন শাব্দিক রূপে ভয়-ভীতি ও শঙ্কা থেকে মুক্তি দেওয়ার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের আমানতের দাবি

নির্ভরতা অর্থে আমানত শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কোরআনের সূরা ইউসুফের দু'টি আয়াতে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমটি হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা একজোট হয়ে পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে হযরত ইউসুফকে তাঁদের সঙ্গে দেওয়ার অনুরোধ জানালে পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের উপর আস্থা রাখতে

১. সূরা বাকারা ২:২৮৩

পারেননি। এ কারণে তারা পিতাকে আস্থা প্রদর্শন করতে মরিয়া হয়ে উঠল। পবিত্র কোরআন তাদের সম্পর্কে বলছে,

قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ ﴿١١﴾

"তারা (ইউসুফের ভায়েরা) বলল ঃ আব্বা! কি ব্যাপার, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না ! অথচ আমরা তার ভালো চাই !"[১]

দ্বিতীয়টি হলো, ভায়েরা ইউসুফের সাথে ঘটনা সংঘটিত করে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার পর তাদের মনগড়া বানানো অজুহাত পিতাকে বুঝাতে গিয়ে বলল ঃ

وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾

"আপনি আমাদের (কথার) উপর আস্থা রাখছেন না, যদিও আমরা সত্য কথাই বলছি।"[২]

প্রথম আয়াতে তারা তাদের পিতাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করতে চাইল যে, আমরা এ আমানতের (ইউসুফের) ব্যাপারে সব ধরণের নির্ভরতার প্রতীক। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদের প্রত্যাশা ছিলো যে, তাদের কথার উপর যেন আস্থা রাখা হয় ; তারা যা কিছু বলছে সবই যেন বিশ্বাসযোগ্য।

পবিত্র কোরআনের আয়াতের আলোকে একথা সূর্যালোকের চেয়েও অধিক স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান শব্দটি তার মৌলিক অর্থ ও ভাব হিসেবে নিরাপত্তা, আমানত ও নির্ভরতাকে বুঝায়।

অব্যয় যোগে ঈমান শব্দের ব্যবহার

উপর্যুক্ত আয়াত দু'টিতে ঈমান শব্দটি অব্যয়[৩] ব্যতীত ব্যবহৃত হয়েছে। এবার অব্যয় যোগে এর ব্যবহার নিরীক্ষণ করা যাক।

আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী "ঈমান" শব্দটি لام অব্যয় যোগে ব্যবহৃত হলে, এর অর্থ দাঁড়াবে, অন্যের কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মান্য করা। এ বিষয়ে বনী ইসরাইলের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মহান আল্লাহ্ প্রসঙ্গ বলেন,

১. সূরা ইউসুফ ১২:১১
২. সূরা ইউসুফ ১২:১৭
৩. ছিলা শব্দের আভিধানিক অর্থ দান, অনুগ্রহ, ক্ষমা ইত্যাদি। কিন্তু আরবী ব্যাকরণে এর একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে হতে কারো মতে, কতিপয় অব্যয়কে হরফে ছিলা বলা হয়। (উদাহরণ স্বরূপ : ب ، لام ، ن ইত্যাদি) সেগুলোকে কতিপয় শব্দের সাথে একীভূত করে দেয়া হয়। এভাবে এ অব্যয়গুলো অতিরিক্ত বলে মনে হলেও এগুলো দ্বারা এ শব্দের অর্থে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এগুলোর আরেকটি সুবিধা হচ্ছে এগুলো সংযোজনের কাজেও আসে। (দেখুন লিসানুল আরব)

www.alqurans.com

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾

"আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা ! যতক্ষণ আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখব না ততক্ষণ তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না।"[১]

এভাবে ঈমান শব্দটি ب অব্যয় যোগে ব্যবহৃত হলে, এটি তার বিশেষ অর্থ তথা শরয়ী ও পারিভাষিক অর্থ প্রকাশ করে। পবিত্র কোরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে,

كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ ﴿٢٨٥﴾

"সকলে ঈমান এনেছে আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ এবং তাঁর পয়গাম্বরগণের উপর।"[২]

এখানে "ঈমান এনেছে" এ অর্থটি ঈমান শব্দের পারিভাষিক অর্থের ভিত্তিতে করা হয়েছে। তবে আসল কথা হলো, এখানে যাঁকে মান্য করা হচ্ছে (অর্থাৎ, আল্লাহ্), প্রকারান্তরে তাঁকে বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতার প্রতীক মনে করা হচ্ছে ; তাঁর উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ করা হচ্ছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার সারকথা

সারকথা হলো, ঈমান শব্দটি সকর্মক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হোক কিংবা অকর্মক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হোক নিরাপত্তা অর্থ প্রকাশক হোক কিংবা বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতা অর্থ প্রকাশক হোক; এবং এটি لام অব্যয় যোগে ব্যবহৃত হোক কিংবা ب অব্যয় যোগে ব্যবহৃত হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটি বিশ্বস্ততা, নির্ভরতা, পূর্ণ আস্থা ও অন্যের সামনে বশ্যতা স্বীকার করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"আম্‌নুন" মূল ধাতু থেকে "মুমিন" এর পারিভাষিক অর্থ

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে মুমিন শব্দের পারিভাষিক অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ "মুমিন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁর বিচারালয়ের সঙ্গে বন্দেগীর সম্পর্ক দৃঢ় করে নিরাপত্তা ও সুস্থতার মতো দৌলতের অধিকারী হন।" কিন্তু মহান আল্লাহর অন্যতম একটি চিরায়ত সৌন্দর্য হলো, অন্য যে কোন ব্যক্তিও যদি তাঁর সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলে, তবে সেও নিরাপত্তা, সুস্থতা, স্থিতিশীলতা ও প্রশান্তির নেয়ামতে সৌভাগ্যশীল হয়ে যায়।

---

১. সূরা বাকারা ২:৫৫
২. সূরা বাকারা ২:২৮৫

এতে করে মুমিন শব্দে ঈমানের সকর্মক ও অকর্মক উভয় অর্থই প্রকাশ পেয়েছে। এমনিতেই একজন প্রকৃত মুমিন একদিকে মহান আল্লাহর বিচারালয় থেকে শান্তি, নিরাপত্তা ও যে কোন ভয়-ভীতি থেকে পরিত্রাণ লাভের গ্যারান্টি পেয়ে যায়। এবং অন্যদিকে সে নিজেও অন্যান্যদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ বনে যায়। যেন সে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতের পূর্ণ সত্যায়ন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

"না তাঁদের জন্য কোন ভয় আছে, না তাঁরা চিন্তিত হবে।"[১]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার এ ঈমান ও বিশ্বাস তাকে সে পর্যায়ে পৌঁছে দিবে, যেখানে পৌঁছার কারণে একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য সবকিছুর ভয় তার অন্তর থেকে বিদায় নিবে। সাধারণ মানুষও তার মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তার নেয়ামতে সৌভাগ্যশীল হবে। বস্তুতঃ সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুমিন হওয়ার যোগ্য।

আমানত অর্থে মুমিন এর ভাবার্থ

যদি ঈমান শব্দটিকে আমানত তথা তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতার দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করা হয়, তবে এক্ষেত্রে মুমিন সে ব্যক্তিকে বলা হবে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে। তার স্বভাবজাত ও কীর্তি এমন প্রশংসনীয় হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপর আস্থা রাখবে। এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান এমন একটি মুক্তা কণিকা, যার দ্যুতি মানুষের স্বভাব ও কীর্তিতে ভেসে উঠবে। বস্তুতঃ ঈমান মানবীয় ব্যক্তিত্বের সে মহান গুণাবলীর নাম, যার মাধ্যমে একজন ঈমানদার ইহলৌকিক জীবনে মহান আল্লাহর সত্ত্বার উপর আস্থা রাখবে, আর সাধারণ মানুষ থাকবে তার (সেই ঈমানদার ব্যক্তি) উপর আস্থাশীল।

ঈমানের বাস্তবতা

যখন আমরা ঈমানের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝে নিই এবং জেনে নিই যে, ঈমান হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা ও নির্ভরতার নাম, তখন ঈমানের বাস্তবতা উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়। বস্তুতঃ ঈমান বলতে আমরা বুঝি, মহান আল্লাহর সত্ত্বা, তাঁর রাসূলগণ, পরকাল এবং আল্লাহর নির্দেশে সংঘটিত সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। পবিত্র কোরআনে পাঁচটি বিষয় তথা-

ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ ﴿١٧٧﴾

---

১. সূরা বাকারা ২:৩৮

www.alqurans.com

"আল্লাহ্, কিয়ামত দিবস, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থাবলী ও সকল নবীগণের নবুয়্যত ও রিসালাতের উপর ঈমান আনা তথা বিশ্বাস স্থাপন করাকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে।"[১]

হাদীসে জিবরাঈলে مَا الْإِيْمَانُ؟ (ঈমান কাকে বলে?) এ প্রশ্নের উত্তরে সাতটি বিষয়ের উপর ঈমান আনাকে আবশ্যক বলা হয়েছে। সেখানে উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয়ের সাথে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ ও তাকদীরের উপর ঈমান আনা- এ দু'টি বিষয়কেও যোগ করা হয়েছে।[২]

আমার লিখিত *'আজযায়ে ঈমান'* নামক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে এ সব বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছি। এখানে শুধু এতটুকু ধারণা দেয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত বিষয়গুলোর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে পরিভাষায় ঈমান বলা হয়।

ঈমানের তিনটি স্তর

কোরআন হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, পূর্ণ বিশ্বাস ও আল্লাহর পরম ভালোবাসাকে প্রকৃত পক্ষে ঈমান বলা হয়। আরো গভীর ভাবে চিন্তা করলে আমরা জানতে পারি যে, পূর্ণ বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল এ ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে।

এক. ইল্‌ম বা জ্ঞান।
দুই. ইরফান বা আল্লাহর মারেফত।
তিন. ইকান বা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস।

১ - ইলম বা জ্ঞান

ঈমানের প্রথম স্তরকে পরিভাষায় ঈমান বিল গাইব বা ইলম (জানা) বলা হয়। কোরআনে করীমে এ সম্পর্কিত আয়াতটি হলো ঃ

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴿٣﴾

"যে সব লোকেরা (আল্লাহকে) না দেখেই তাঁর উপর ঈমান আনে।"[৩]

যারা মহান আল্লাহকে না দেখেই ঈমান আনে, প্রকৃতপক্ষে তারা শুধু এ কারণেই ঈমান আনে যে, তাদের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়টি সেই মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে পৌঁছেছে, যিনি আল্লাহর হাকীকত বা বাস্তবতাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব, ঈমানের অন্যতম প্রধান চাহিদা হলো, আল্লাহ্ এবং অন্যান্য

[১]. সূরা বাকারা ২:১৭৭
[২]. সহীহ্ মুসলিম; ১:৪০, হাদীস :৭
[৩]. সূরা বাকারা ২:৩

অদৃশ্য বিষয়গুলোকে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করা ব্যতীত শুধু এ কারণে বিশ্বাস করতে হবে যে, মুমিনগণের কাছে তাঁর ইলম সেই সত্যবাদী সংবাদদাতার মাধ্যমে পৌছেছে, যিনি মহান আল্লাহর সত্তাকে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। ঈমান বিল গাইব অস্বীকারকারীদের অন্তর অসৎ এবং নষ্ট অন্তর বলে বিবেচিত। আল্লাহর সত্তাকে নিজ চোখে না দেখে শুধু সত্যবাদী সংবাদদাতার (মুহাম্মদ) কথার উপর ভিত্তি করে তাঁকে (আল্লাহ্) মেনে নেয়ার নামই হলো ঈমান। (আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে) হযরত মুসা আলাইহিস সালামের উম্মতের উত্থাপিত শর্তটি ছিল ঃ

لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴿٥٥﴾

"আমাদের নিজ চোখে আল্লাহকে না দেখে শুধু আপনার কথার উপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আনতে পারব না।"[১]

এভাবেই ঈমান বিল গাইবকে অস্বীকার করা হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে যখন তাদের কথা মতো তাদেরকে আল্লাহর এক ঝলক নূর (মতান্তরে মহান আল্লাহর একটি ধ্বনি) দেখানো হলো, তারা তা ধারণ করতে পারল না। তুর পর্বতের উপর আল্লাহকে দেখতে যাওয়া সত্তর জনের সকলেই মৃত্যুর শিকার হয়।

পূর্ববর্তী নবীগণ ও জগতের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী পদ্ধতিতে পার্থক্য

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যে বিশ্ব সত্তার উপর ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তিনি নিজেও তাঁকে সরাসরি নিজ চোখে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহর সাথে তাঁর কথা হতো। এ কারণে হযরত মুছা আলাইহিস সালামসহ অন্যান্য সকল পূর্ববর্তী নবীগণের ঈমানের দাওয়াত হ্যাঁ এবং না এ দু'টি শব্দের আওতাধীন ছিল।

﴿ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

প্রত্যেক নবী হ্যাঁ ও না সম্বলিত এ কালেমাটি তাঁদের নিজ নিজ উম্মতদের নিকট উপস্থাপন করতেন। প্রত্যেক নবীকে তাঁদের উম্মত কর্তৃক প্রশ্ন করা হতো যে, "আপনি কি আল্লাহকে সরাসরি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন?" তাঁদের উত্তর ছিল 'না'। এর কারণ হলো, নবীগণের সে দেখাটি প্রত্যক্ষ ভাবে ছিল না ; বরং তাদের নিকট তা ছিল বিশ্বাস নির্ভর একটি ব্যাপার। এর বিপরীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু

[১]. সূরা বাকারা ২:৫৫

www.alqurans.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি উম্মতের নিকট যে কালেমাটি পেশ করলেন, সেটির ভিত্তি ছিল বিশ্বাস এবং দর্শন উভয়ের উপর। কালেমাটি নিম্নরূপ:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর অস্তিত্বে কেউ শরীক নেই।"

লক্ষ্য করুন, এখানে 'শাহাদত' বা 'সাক্ষ্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (আরবী ভাষায়) 'শাহাদত' শব্দটি 'শুহুদ' শব্দমূল থেকে নির্গত। অভিধান বেত্তাগণ 'শাহাদত' শব্দের ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيْرَةِ.

'শাহাদত' হলো, দৃষ্টির নিমিত্তে উপস্থিত হওয়া। এ দৃষ্টি ললাট চক্ষুর মাধ্যমেও হতে পারে অথবা অন্তর চক্ষুর মাধ্যমেও হতে পারে।[১]

এ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতের প্রথম এবং শেষ নবী, যিনি মহান আল্লাহর দর্শন ও ইলমের ভিত্তিতে এ সাক্ষ্য দেন অন্যভাবে বলতে গেলে এর ভাবার্থ হবে নিম্নরূপ ঃ

'আরশ থেকে পাতাল পর্যন্ত পুরো বিশ্বজগতে যত বস্তু এবং অস্তিত্ব বিদ্যমান, এগুলোর কোনটিই এ যোগ্যতা রাখেনা যে, এদের সামনে প্রার্থনার মস্তক অবনত করা যাবে। জগতের কোন মানুষ এর উপযুক্ত না যে, তার ইবাদত করা যাবে।'

শাহাদতের এ দাবি সে ব্যক্তিত্বই করতে পারেন, যিনি আরশ থেকে পাতাল পর্যন্ত প্রতিটি অণুকণা প্রত্যক্ষ করেন। সেগুলোর বাইরের অংশ এবং ভিতরের অংশ উভয়টিই দেখেন। এগুলোর সামর্থ, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত আছেন। এরপর তিনি বলেন যে, আমি বিশ্বজগতের প্রতিটি অণুকণাকে যাচাই করেছি ; পরীক্ষা করেছি। এগুলোর বৈশিষ্ট্য ও আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছি। প্রাণীকুলের কোন একটি অস্তিত্বকেও ইবাদতের উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়নি। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে হ্যাঁ না'র এ সাক্ষ্য এ কথার তাগিদ দেয় যে, কেবল বিশ্বজগতের প্রতিটি অণুকণার প্রকৃতি কেন, বরং তিনি মহান আল্লাহর সত্ত্বাকেও সরাসরি দেখেছেন এবং এর ভিত্তিতেই তিনি বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেবল মহান আল্লাহর সত্ত্বাই বন্দেগী এবং ইবাদতের উপযুক্ত।

[১]. আল মুফরাদাত : ইমাম রাগেব ইসফাহানী; 'শাহাদাত' শব্দমূলের অধীনে দ্রষ্টব্য।

যাই হোক, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন প্রথম এবং শেষ নবী, যিনি প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে মহান আল্লাহ্ ব্যতীত বিশ্বজগতের প্রতিটি অস্তিত্বের প্রভুত্বের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছেন। আর এ প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতেই তিনি মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও প্রভুত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহর একত্ববাদের এ ধারণা লাভ হলো তাঁর পয়গাম্বরী বিশ্বাসের প্রধান স্তর। এ শাহাদত দিয়ে আমাদের ঈমানের সূচনা হয়। অর্থাৎ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে যে সব বিষয় আমাদের নিকট পেশ করেছেন, না দেখে সেগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এটিই হলো ঈমান বিল গাইব। আর এটিই ইসলামী শরীয়তের সর্ব প্রথম স্তর তথা ইলম বা জ্ঞানের স্তর।

২ - ইরফান বা আল্লাহর মারেফত

প্রথম স্তর বা ইলমের স্তরের পর আসে দ্বিতীয় স্তর, যাকে ইরফান বলা হয়। অর্থাৎ, যে সত্ত্বাকে চোখে না দেখেই বিশ্বাস করা হয়। এ সত্ত্বার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি আর আলামতগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সেগুলোর ভিত্তিতে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে পরিপক্ক করি। এ স্তরের বিশ্বাসের বিষয়টি পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١

"আর খোদ তোমাদের মধ্যে (অনেক আলামত) রয়েছে, তোমরা কি তা দেখনা?"[১]

হে আল্লাহর বান্দারা ! মহান আল্লাহর কুদরত, তাঁর অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য কারিগরির উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা ! বুঝে-শুনে এবং চিন্তা-গবেষণা করে সঠিক ফলাফল নির্ণয় করার জন্য সব ধরণের প্রতিভা তোমাদের মাঝে অন্তর্নিহিত রয়েছে। চুপিসারে দেখ, মহান আল্লাহর কুদরতের সকল প্রকৃতি আর নিদর্শন খোদ তোমাদের মধ্যেই মজুদ রয়েছে। মনুষ্যতের অন্ধকার মুখাবরণ ফেলে দিয়ে প্রকৃতি ও বাস্তবতাকে বুঝার চেষ্টা করো। তারপর দেখবে, তোমাদের অন্তপুরে বস্তুবাদের প্রকৃতির ধারণা কী চমৎকার রূপে ঝলমল করছে ! পবিত্র কোরআনের অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

[১]. সূরা যারিয়াত ৫১:২১

www.alqurans.com

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴿٥٣﴾

"আমি অচিরেই (পৃথিবীর) বিভিন্ন প্রান্তে এবং খোদ তাদের মধ্যেও আমার নিদর্শন সমূহের প্রকাশ ঘটাব। এক পর্যায়ে তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তিনিই হক।"[১]

বিষয়টি আমরা নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে বুঝে নিতে পারি ঃ

"কোন এলাকায় যদি কোন মানুষকে হত্যা করা হয়, এবং কোন এক ব্যক্তি অন্যদেরকে বলে যে, অমুক ব্যক্তি এই ঘরে খুন হয়েছে। লোকটিকে অমুক ব্যক্তি খুন করেছে। সে আরো বলে যে, লোকটি তার সামনেই খুন হয়েছে।"

এখানে এ ব্যক্তির বর্ণনার উপর ভিত্তি করে খুনের ঘটনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হলো প্রথম স্তরের বিশ্বাস তথা 'ঈমান বিল গাইব'।

ইতিমধ্যে রক্তমাখা একটি চাকু হাতে ঘরটি থেকে এক ব্যক্তি দৌড়তে দৌড়তে বের হয়ে আসল। চিন্তিত-পরিশ্রান্ত সে ব্যক্তির পরিহিত কাপড়ে রক্তের দাগও দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় সে এদিক ওদিক ধেয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটির মধ্যে হত্যার এ চিহ্নগুলো দেখে কেউ যদি তাকে হত্যাকারী হিসেবে বিশ্বাস করে নেয়, তবে এটি হবে ঈমানের দ্বিতীয় স্তর তথা ইরফান।

কিন্তু এখানেও ভুল বুঝাবুঝির একটি সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এমনওতো হতে পারে যে, সে ব্যক্তি এইমাত্র একটি জন্তু জবাই করে এসেছে এবং প্রকৃত খুনী অন্য এক ব্যক্তি!! ধেয়ে বেড়ানো এ লোকটি হত্যার ঘটনাটি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছে। হত্যাকান্ডের নির্মমতার ভয়ে সে সেখান থেকে অন্যত্র পালিয়ে বেড়িয়েছে। সাধারণ মানুষ তার পরিহিত কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে তাকে খুনী মনে করেছে।

কিন্তু যে ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল, হত্যাকান্ডের ঘটনাটি সে দিন-দুপুরে নিজের চোখে দেখেছে, খুনী এবং খুন হওয়া ব্যক্তিদ্বয়কে সে সনাক্তও করতে পেরেছে, তবে এ ব্যক্তি হত্যাকান্ডের ঘটনায় 'প্রত্যক্ষ সাক্ষী' (সাহেবে ইকান) হিসেবে বিবেচিত হবে। পুরো পৃথিবীবাসী যুক্তিবাদী মতবাদ ও দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে লক্ষ-কোটি যুক্তি নিয়ে উপস্থিত হলেও এ ব্যক্তিকে কখনো নিজ স্থান থেকে সরে আসতে প্রস্তুত করতে পারবে না। কোটি কোটি দলীল শোনার পরও সে তাদের কথা বিশ্বাস করতে তৈরী হবে না। তাদের সকলের সবকটি দলীল শোনার পরও সে শুধু এটিই বলবে যে, আমি কি তোমাদের উত্থাপিত দলীল দেখব, নাকি আমার চোখ

[১]. সূরা হামীম সিজদা ৪১:৫৩

দেখা চির সত্যটিকে বিশ্বাস করব। বিশ্বাসের এ স্তরটি হলো মূলতঃ পয়গাম্বরী বিশ্বাসের স্তর। যেখানে অবতীর্ণ হওয়ার দরূণ চোখের সামনের সব পর্দা উঠে গিয়ে বস্তুর প্রকৃতি চোখের সামনে চলে আসে।

৩ - ইকান বা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস

এ পয়গাম্বরী বিশ্বাসের ধারণাটিকে পরিষ্কার রূপে বুঝানোর জন্য পবিত্র কোরআনে কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। হযরত উযাইর আলাইহিস সালামের ঘটনা সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। বহুকাল পূর্বে বিরান হয়ে যাওয়া একটি লোকালয়ের[১] পাশ দিয়ে যখন তিনি যাচ্ছিলেন, সেই জনমানবহীন লোকালয়টি দেখে তাঁর মনে হলো যে ঃ

أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿٢٥٩﴾

"মৃত্যুর পর আল্লাহ্ এ বসতিকে আবার কীভাবে জীবিত করবেন?"[২]

এখানে হযরত উযাইর আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর মৃতকে জীবিত করার কুদরতকে অস্বীকার করছেন না (নাউযু বিল্লাহ্)। বরং, মূলতঃ জনমানবহীন লোকালয় দেখে তাঁর মনে হলো যে, আমি যদি এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতির মানুষগুলোকে পুনরায় জীবিত হতে দেখতাম! তাঁর এ বাসনার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ খোদ তাঁকে দিয়েই এটি করে দেখালেন ঃ

فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ ﴿٢٥٩﴾

"আল্লাহ্ একশত বছর পর্যন্ত তাঁকে (উযাইর) মৃত অবস্থায় রাখলেন। শত বছর পর তাঁকে জীবিত করলেন। আর তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তুমি মৃত অবস্থায় কত দিন ছিলে? উত্তরে তিনি বললেন, এক দিন বা এর চাইতে আরো কম সময় হবে! মহান আল্লাহ্ তাঁকে বললেন ঃ না! তুমি বরং একশত বছর মৃত অবস্থায় ছিলে।"[৩]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, একশত বছরের স্বপক্ষে যুক্তি হলো ঃ

[১]. এ জনপদের ব্যাপারে প্রায় মুফাসসিরীনদের ধারণা হচ্ছে, তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দসের (জেরুজালেম) শহর। কিন্তু কোরআন করীমে এর সুস্পষ্ট হদিস পাওয়া যায়না। কোরআন করীমে শুধু "কোন জনপদ" এর নাম দ্বারা তা উল্লেখ করা হয়েছে।

[২]. সূরা বাকারা ২:২৫৯

[৩]. সূরা বাকারা ২:২৫৯

www.alqurans.com

وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ﴿٢٥٩﴾

"তুমি তোমার (আরোহনের) গাধাটির দিকে তাকাও।"[১]

তিনি তাঁর গাধাটির দিকে চেয়ে দেখলেন, সেখানে গাধার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। তার হাড় গুলো পর্যন্ত মাটি হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ﴿٢٥٩﴾

"নিজের পানাহার গুলোর দিকে তাকাও, এ দীর্ঘ সময়ে এগুলো একটু বাসি পর্যন্ত হয়নি।"[২]

একদিকে গাধার হাড়গুলো মাটিতে মিশে গেছে, আবার অন্য দিকে এ দীর্ঘ সময়ে পানাহারগুলো একটু বাসি পর্যন্ত হয়নি!

অতঃপর হযরত উযাইরের আলাইহিস সালাম চোখের সামনে তাঁর আরোহনের জন্তুটিকে জীবিত করা হলো। এ আশ্চর্যজনক ঘটনাটি দেখে তিনি আকস্মিক চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ

أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

"আমি দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন।"[৩]

এখন প্রশ্ন হলো, ইতিপূর্বে তিনি কি জানতেন না যে, মহান আল্লাহ্ এ কাজ করার ক্ষমতা রাখেন? বাস্তবেই যদি তাঁর এটি জানা না থাকে, তবে তিনি কীভাবে নবুয়্যত প্রাপ্ত হয়েছিলেন? নবীগণ তো প্রথম থেকেই মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনেন। পবিত্র কোরআন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলছে, যদিও তিনি আগে থেকেই ঈমান বিল গাইবের ধারণা রাখতেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে তিনি (আল্লাহ্) তাঁকে (উযাইর) ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করতে চাইলেন। তাই এখানে "আমি দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ্ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন।" আয়াতটির ভাবার্থ দাঁড়াবে, আমি এবার পুণর্বার জীবিত করার ধারণাটিকে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করলাম। এখন আমার ঈমান, ইকান তথা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবার আমি প্র্যাকটিক্যালি বলতে পারি যে, মহান আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। অতএব, তাঁর এ প্রশ্ন করাটা

১. সূরা বাকারা ২:২৫৯
২. সূরা বাকারা ২:২৫৯
৩. সূরা বাকারা ২:২৫৯

ইলম বা প্রথম স্তরের ঈমান হাসিল করার নিমিত্তে নয়, বরং এটি ছিল ইকান বা সর্বোচ্চ স্তরের ঈমান হাসিল করার নিমিত্তে।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ব্যাপারেও এ ধরণের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন যে ঃ

رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٢٦٠﴾

"হে আল্লাহ্! আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান।"[১]

এখানেও সেই একই প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কি জানতেন না যে, মহান আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন? বাস্তবেই যদি তিনি না জানতেন, তবে তিনি কীভাবে পয়গাম্বর হয়েছিলেন? পবিত্র কোরআন বলছে যে, ইতিপূর্বে তাঁর ঈমান ছিল 'ঈমান বিল গাইব' ও 'ইরফান' এর পর্যায়ের। এখন তিনি প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর তথা 'ইকান' এর স্তরে পৌঁছতে চাচ্ছেন। এ কারণে মহান আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীমের আলাইহিস সালাম কাছে প্রশ্ন করেছেন ঃ

قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ﴿٢٦٠﴾

"তুমি কি এ ব্যাপারে ঈমান আন নি ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ অবশ্যই এনেছি। তবে অন্তরের প্রশান্তি লাভের জন্য আমি এটিকে দৃশ্যত দেখতে চাচ্ছি।"[২]

মহান আল্লাহ্ পূর্বে থেকেই জানতেন যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কোন উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন করছেন। কিন্তু তারপরও এ কথোপোকথন ছিল সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। এ প্রশ্নোত্তরের পর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

১. সূরা বাকারা ২:২৬০
২. সূরা বাকারা ২:২৬০

www.alqurans.com

"তুমি চার চারটি পাখি ধরে নিয়ে আস। এবং সেগুলোকে তোমার সঙ্গে পরিচিত করে তোল। অতপর (এগুলোকে টুকরো টুকরো করে টুকরাংশ গুলো একসাথে মিশিয়ে নাও। (এবং) সেগুলোর প্রতিটি খন্ড আলাদা আলাদা পাহাড়ে ফেলে এসো। এরপর পাখিগুলোকে ডাকো। দেখবে, পাখিগুলো তোমার নিকট ঝাঁক বেঁধে উপস্থিত হবে। আর জেনে রেখো, মহান আল্লাহ্ ক্ষমতাবান, বিজ্ঞ।"[১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঈমান ও বিশ্বাস তো পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু তিনি স্বচক্ষে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে 'আইনুল একীন' তথা 'সর্বোচ্চ স্তরের ঈমান' হাসিল করতে চাইলেন এবং মহান আল্লাহ্ এটি তাঁকে দানও করলেন।

একটু চিন্তা করে দেখুন, অন্তরের প্রশান্তি লাভের জন্য হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের এ কামনা কখনো প্রথম স্তরের ঈমান হাসিলের নিমিত্তে ছিল না। বরং এটি ছিল তৃতীয় স্তরের ঈমান তথা 'সর্বোচ্চ স্তরের ঈমান' (ইকান) হাসিল করার নিমিত্তে। হযরত ইব্রাহীমকে আলাইহিস সালাম সর্বোচ্চ স্তরের ঈমান (ইকান) পর্যন্ত পৌছানোর উদ্দেশ্যে আসমান-জমিনের নিদর্শনসমূহ দেখানোর কথা পবিত্র কোরআনের অন্য আরেকটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

"আর এভাবে আমি ইব্রাহীমকে আসমান-জমিনের আশ্চর্যজনক নিদর্শন সমূহ দেখিয়েছি, যাতে করে সে একজন অন্যতম সর্বোচ্চ স্তরের ঈমানদার হয়ে যায়।"[২]

এখন একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ সকল কুদরতী নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁকে 'ইকান' তথা 'সর্বোচ্চ স্তরের ঈমান' এর স্থানে পৌছানো। এটি ঈমান এবং একীনের সর্বশেষ স্তর।

সারকথা হলো, ঈমানের মূল ভিত্তি হলো একীন। আর এ একীনের তিন তিনটি স্তর রয়েছে। ঈমান বিল গাইব, ইরফান ও ইকান।

এ তিনটি স্তরকে সূফীবাদীগণ তাঁদের পরিভাষায় 'ইলমুল একীন', 'আইনুল একীন' ও 'হক্কুল একীন' নামে আখ্যায়িত করেন। এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য তাঁরা এ উদাহরণটি পেশ করে থাকেন ঃ

১. সূরা বাকারা ২:২৬০
২. সূরা আনআম ৬:৭৫

"কেউ মটকায় পড়ে থাকা একটি কৌটার দিকে নির্দেশ করে বলে যে, এ কৌটায় দুধ রয়েছে। ব্যক্তিটির কথার উপর ভিত্তি করে যদি কেউ না দেখেই কথাটি বিশ্বাস করে নেয়, তবে এটিকে 'ইলমুল একীন' বলা হবে। যদি কৌটাটির ঢাকনা সরিয়ে দেখার পর কথাটি মেনে নেয়া হয়, তবে এটি হবে 'আইনুল একীন'। আর যদি সব ধরণের সন্দেহের উর্ধ্বে থাকার জন্য তা পান করে সেগুলো দুধ বলে একীন হাসিল করা হয়, তবে এটি হবে হক্কুল একীন।

www.alqurans.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুমিন এবং তার বৈশিষ্ট্য

পূর্বোক্ত আলোচনায় একথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঈমান শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট 'أَمْنٌ' শব্দমূল থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো, শান্তি এবং নিরাপত্তা। যদি আমাদের ঈমান নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস বলে প্রমাণ হয়, তবে বুঝে নেয়া উচিত যে, ঈমান আমাদের ব্যক্তিত্বে বাস্তবায়িত হয়েছে। আর যদি আমাদের ঈমানের দ্বারা অন্যজনের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ইত্যাদি সংরক্ষণ না থাকে, তবে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের ঈমানে এখনো দুর্বলতা রয়ে গেছে।

ঈমানের এ বিশ্লেষণের পর আমাদের জানা উচিত যে, একজন মুমিনের[১] পরিচয় কি? কোরআন, হাদীস এবং ইসলামী শিক্ষা একজন মুমিনের কি কি আলামতের কথা বলেছে? এবং কোন কোন বিষয় তার জন্য আবশ্যকীয় হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছে? প্রাথমিকভাবে এ আলোচনাটিকে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারেঃ

[১]. مُؤْمِنٌ শব্দটি কর্তাবাচক বিশেষ্য। যার অর্থ, লিসানুল আরব (১৬:১৬২-১৬৩) প্রণেতার মতে, প্রথমত সত্যায়নকারী। সূরা ইউসুফের এ আয়াতে এ ভাবার্থটি ফুটে উঠেছে, وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ "আর আপনি আমাদের কথার সত্যায়ন করবেন না, যদিও আমরা সত্যকথা বলে থাকি।" (সূরা ইউসুফ ১২:১৭) আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বলা হয়েছে, يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ "তিনি আল্লাহ ও মুমিনদের কথা বিশ্বাস করেন।" (সূরা তাওবা ৯:৬১) এর দ্বারা একথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আভিধানিক দৃষ্টিতে সত্যায়নকারীকে মুমিন বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ মুমিন হচ্ছেন তিনি, যিনি অন্যদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার নামও الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ (নিরাপত্ত দানকারী, হেফাযতকারী) অর্থাৎ আপন সৃষ্টিকে জুলুম হতে নিরাপত্তা দান করা। মুমিন শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী পরিভাষায় এ আভিধানিক অর্থদ্বয় সক্রিয়। কেননা, প্রথম অর্থের দিক দিয়ে জুযাজের মতে, মুমিন শব্দের সংজ্ঞা এই, الإيمانُ إظهارُ الخضوع والقبولِ للشَّريعة ولما أتى به النبيُّ ﷺ واعتقادُه وتصديقُه بالقلب فمن كان على هذه الصِّفة فهو مُؤْمِنٌ مُسْلِم غير مُرْتاب ولا شاكٍّ "ঈমান হচ্ছে বিনয়ী প্রকাশ ও শরীয়ত এবং ঐ সকল বিষয় কবুল করা, এগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্তরে এগুলোকে সত্যায়ন করার নাম, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন। যে ব্যক্তি এ গুণ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে এবং অন্তরে সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ থাকবেনা সে মুমিন।" (লিসানুল আরব ১৬:১৬৩) দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে মুমিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার সত্ত্বা হতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রকাশ পাবে। لا يصدر عن الخير إلا الخير "সৎ ব্যক্তির নিকট থেকে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু বের হয়না।" মুমিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজকে আল্লাহর আযাব হতে, অন্যদেরকে নিজের জোর-জুলুম হতে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলদেরকে মিথ্যারোপ করা হতে নিরাপত্তা দিবে। এ পথটি যদিও দৃশ্যতঃ কণ্টাকাকীর্ন মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে কুসুমআস্তীর্ণ, নিরাপত্তা ও শান্তির পর।

এক. মুমিনের সংজ্ঞা।

দুই. মুমিনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য।

মুমিনের সংজ্ঞা[১]

মুমিনের সংজ্ঞায় সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু বললে যথেষ্ট যে, মুমিন সে ব্যক্তিকে বলা হবে, যার মধ্যে ঈমানের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ভাবগত বিবেচনায় পরিপূরক হলেও পুরোপুরিভাবে মনতুষ্ট নয়। এ কারণে এটির বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। পবিত্র কোরআনে মুমিনের সংজ্ঞায় একটি পরিপূরক আয়াত নাযিল হয়। সেটি হলো ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾

"মুমিন সে সকল ব্যক্তিদেরকে বলা হয়, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, এবং এতে তারা কোন সন্দেহ-সংশয়ে পড়েনি। অতপর তারা তাদের জান-মাল খরচ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এঁরাই সত্যবাদী।"[২]

এ আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয় ঃ

আরবী শব্দ 'إِنَّمَا' এর ব্যবহার

উপর্যুক্ত আয়াতের শুরুতে আরবী শব্দ 'إِنَّمَا' ব্যবহৃত হয়েছে। যেটিকে আরবী ভাষায় 'কালেমায়ে হাস্‌র' বলা হয়।[৩]

উর্দূ ভাষায় এর অনুবাদ হবে "اس کے سوا نہیں", (বাংলায় "শুধু এটিই")। তবে আরবী ভাষার প্রত্যেক পড়ুয়া জানেন যে, 'إِنَّمَا' শব্দটির মধ্যে 'হাস্‌র' বা

[১]. দৃশ্যতঃ মুমিন ও মুসলিম শব্দদ্বয় সমার্থবোধক বলে মনে হয়। যেরূপ ইমাম আবু হানিফার মত। (দেখুন ফেকহে আকবর) কিন্তু তন্মধ্যে সামান্য ব্যবধান রয়েছে। তা হচ্ছে, ঈমান অন্তরের আনুগত্যের নাম। আর ইসলাম হচ্ছে, বাহ্যিক আনুগত্যের নাম। এ কারণে সূরায়ে হুজুরাতে আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে মুমিনকে মুসলিমের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে।

[২]. সূরা হুজুরাত ৪৯:১৫

[৩]. লিসানুল আরব প্রণেতার মতে, إِنَّمَا শব্দটি বর্ণিত বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশার্থে এবং এতদভিন্ন সবকিছুকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার জন্য আসে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, কোন আয়াতের ভাবার্থের মধ্যে অধিক জোর ও ভার সৃষ্টি করা। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ উপযোগি যে, লিসানুল আরব প্রণেতা মুমিন শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এ আয়াতটি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন এবং একাধিক দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

পরিপূরকের যে অর্থটি বিদ্যমান, তা উল্লেখিত উদ্দেশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ'। এ শব্দটি আয়াতের শুরুতে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এর ভাবার্থ দাঁড়াবে, মুমিন বলতে শুধুমাত্র সে সকল ব্যক্তিদেরকে বুঝাবে, যাঁদের মধ্যে পূর্ব বর্ণিত গুণাবলী ও বিশেষত্বগুলো বিদ্যমান থাকবে।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান

আরবী শব্দ 'إِنَّمَا' এর ব্যবহারের পর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার বিষয়টি অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আগে আনা হয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমানের অবস্থান ভিত্তি ও বুনিয়াদ স্বরূপ। তাই এগুলোর উপর ঈমান আনলে অন্যান্য বিষয়ের[১] উপরও ঈমান আনা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। যদি কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর প্রকৃত পক্ষে ইয়াকীন আর আস্থা রাখে, তখন দ্বীনের প্রতিটি বিষয় গ্রহণ করে নেয়া তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে থাকা

ঈমান হলো 'তাসদীকে কলবী' বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। অন্তরে সন্দেহ-সংশয় পুঁতে রেখে কেবল মুখে বিশ্বাসের কথা বললে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নিকট এর কোন মূল্য নেই। এ কারণে মুমিনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, "মুমিন সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার অন্তরে আল্লাহ্ এবং তাঁর সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয়ও স্থান পাবে না। তাই পবিত্র কোরআন সর্ব প্রথম এ কথাটি ঘোষণা করে। পবিত্র কোরআন বলছে ঃ

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۝٢

[১]. এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, সূরায় বাকারায় পাঁচটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীকে মুমিন বলা হয়েছে, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ "" (সূরা বাকারা ২:১৭৭) এটিকে ভিত্তিমূল মনে করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ঈমানের শাখা-প্রশাখা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, يجب أن يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالي والحساب والميزان والجنة والنار حق "এ কথাটির উচ্চারন করা আবশ্যক যে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর ওপর, তার ফেরেশতাদের ওপর, তার কিতাবসমূহের ওপর, তার রাসূলদের ওপর, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর, আল্লাহর পক্ষ হতে তকদীরের ভাল-মন্দের ওপর, হিসাব-কিতাব, পরিমাপ যন্ত্র, এবং জান্নাত ও দোযখ সত্য এর ওপর।"(আল ফেকহুল আকবর পৃ. ১১-১৪) ঘটনা এই যে, ইমাম আবু হানিফার এই মতের উৎস হচ্ছে, কোরআনের উপর্যুক্ত আয়াত এবং হাদিসে জিবরাঈল। পার্থক্য শুধু সংক্ষিপ্ত ও সবিস্তারের। অন্যথায় যেভাবে কালেমায়ে তাইয়িবার দু'টি বাক্যে- যার শব্দগুলো হুবহু আয়াতের অনুরূপ, গোটা দ্বীন সংকুলান হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ওপর ঈমান আনার আলোচনায় বাস্তবে পুরো ইসলামের আলোচনা রয়েছে।

www.alqurans.com

"এটি (আল কোরআন) পবিত্র গ্রন্থ। এটির মধ্যে (এটি আল্লহর কালাম হওয়ার মধ্যে) কোন সন্দেহ নেই।[১]

মহান আল্লাহ্ সংশয় ও দোদুল্যমনাকে মুনাফিকের আলামত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন ঃ

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۝١٤٣

"তারা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলে আছে। এদের পক্ষও নেয় না, আবার ওদের পক্ষও নেয় না।"[২]

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, ঈমান এমন একটি অপ্রকাশ্য ও বিশ্বাসগত অবস্থার নাম, যেখানে পৌঁছার দরুণ মানুষের সব ধরণের সংশয়-সন্দেহ, চিন্তা ও দোদুল্যমানতা দূর হয়ে যায়। আর মানুষের এমন দৃঢ় বিশ্বাস (আধ্যাত্মিক পরিভাষায় 'হক্কুল একীন') হাসিল হয়ে যায় যে, দুনিয়ার কোন শক্তি, বিরুদ্ধবাদীদের কোন যুক্তি এবং বিশ্বজগতের কোন উৎকর্ষ-আবিষ্কার তাকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলতে পারে না। এরপর তার বিশ্বাসে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হওয়া, তার জীবন পথে পথভ্রান্ততা পয়দা হওয়া এবং তার পাগুলো ভ্রান্তপথে চালাব।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাস্তায় জান-মাল খরচ করে জিহাদ

ঈমানের দাবির পর সেটির পরিপক্কতা যাচাই করার বিষয়টি উঠে আসে। কেননা, মহান আল্লাহ্ ঈমানের দাবিদারদের সত্য মিথ্যা তাদের আমল ও কৃতকর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তিনি তাদের এ দাবিকে সত্য কিংবা মিথ্যা প্রমাণ করেই ছাড়েন।[৩]

ঈমান বলা হয়, إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ "মুখের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে।"

মুখের স্বীকারোক্তি হলো প্রকাশ্য একটি বিষয়। অপরপক্ষে অন্তরের বিশ্বাস হলো অপ্রকাশ্য একটি বিষয়। কেননা, এটি একটি অভ্যন্তরীণ অবস্থা। তাই এটির যাচাইয়ের জন্য মহান আল্লাহ্ জান-মাল খরচ করে জিহাদ করার শর্ত জুড়ে

[১]. সূরা বাকারা ২:২

[২]. সূরা নিসা ৪:১৪৩

[৩]. এ ব্যাপারে কোরআনের অসংখ্য আয়াতে পরিস্কারভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা আনকবুতের শুরুতেই ইরশাদ হয়েছে,

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।"

www.alqurans.com

দিয়েছেন। এতে করে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, কে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং কে কেবল মুখে গুরুত্বহীনভাবে স্বীকার করে নেয়ার নীতি অবলম্বন করেছে।

জান-মাল খরচ করে জিহাদ কেন?

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম কেন জান-মাল খরচ করে জিহাদের শর্ত কেন জুড়ে দেয়। তারপরও এর আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য আমি পবিত্র কোরআনের আরো কয়েকটি আয়াত পেশ করছি, যাতে করে এ গুরুত্বপূর্ণ শর্তের হেকমত পরিষ্কার হয়ে যায়।

বিশ্বাসে হ্রাস-বৃদ্ধি

পবিত্র কোরআন আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেয় যে, অন্তরের বিশ্বাস ও একীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার নামই হলো ঈমান। আর এ অবস্থা ধীরে ধীরে জন্ম নেয়। প্রাথমিক অবস্থায় এটি দুর্বল হলে, বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞানার্জন করে এ অবস্থাটিকে পরিপক্ক করার জন্য মানুষকে পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ ﴿١٣٦﴾

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন।"[১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً ﴿٢٠٨﴾

"হে মুমিনগণ ! তোমরা পুরোপুরি ভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।"[২]

এ আয়াত দু'টিতে সম্বোধন কাফের-মুশরিকের দিকে নয়, বরং মুমিনের দিকেই করা হয়েছে। সাথে সাথে আয়াত দু'টিতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ঈমানের এমন একটি স্তর রয়েছে, যার সাহায্যে তোমরা কুফরী থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে পার। তেমনি ভাবে ঈমানের দ্বিতীয় স্তরের সাহায্যে তোমরা মুক্তি পেতে পার, আর এটিকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর বলে মনে করা হয়। তাই তোমরা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাক। আংশিকভাবে দ্বীন মানার পরিবর্তে পরিপূর্ণভাবে দ্বীনে প্রবেশ করো। জীবনের কিছু অংশে ধর্ম অনুসরণ করার পরিবর্তে সর্বাঙ্গে ধর্ম পালন কর। মানুষ যেভাবে দুনিয়ার পেছনে ছুটা-ছুটি করতে করতে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে ; জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে,

[১]. সূরা নিসা ৪:১৩৬
[২]. সূরা বাকারা ২:২০৮

কিন্তু তার চাহিদা কখনো শেষ হয় না, তেমনি ভাবে ﴿فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ﴾ 'তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো'[১] এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলাম ঈমানদারদেরকে এ উপদেশ দেয় যে, তারা যেন জীবনের কোন বিশেষ বিষয়ে গিয়ে থমকে না দাঁড়ায়, বরং জীবন পথের এ যাত্রার ন্যায় তাদের দ্বীন-ঈমানে উন্নতির এ সফরও জারি থাকা উচিত।

যে সব বিষয় মানুষের ঈমান আর ইয়াকীনে পরিপক্কতা সাধন করতে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং যে সব বিষয় ঈমান পরিপন্থী, সেগুলোকে ঈমানের খাতিরে পরিত্যাগ করা, ঈমানে পরিপক্কতা ও ইয়াকীনে শক্তি বাড়ানোর একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

«حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ».

"প্রত্যেক অপকর্মের মূলভিত্তি হলো দুনিয়ার লোভ-লালসা।"[২]

কিন্তু এর বিপরীতে বলা হয়েছে ঃ

«رَأْسُ الحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ».

"বিজ্ঞতার মূলভিত্তি হলো আল্লাহর ভয়।"

এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভের জন্য সূরা তাওবা'র নিম্নোক্ত আয়াতটি পর্যালোচনা করা অতীব জরুরী। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"মহান আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, এবং এর প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে বেহেশ্‌ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শত্রুদেরকে হত্যা করে এবং

[১]. সূরা বাকারা ২:১৪৮
[২]. মিশকাত শরীফ : কিতাবুর রিকাক, পৃ. ৪৪৪

www.alqurans.com

দিয়েছেন। এতে করে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, কে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং কে কেবল মুখে গুরুত্বহীনভাবে স্বীকার করে নেয়ার নীতি অবলম্বন করেছে।

জান-মাল খরচ করে জিহাদ কেন?

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম কেন জান-মাল খরচ করে জিহাদের শর্ত কেন জুড়ে দেয়। তারপরও এর আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য আমি পবিত্র কোরআনের আরো কয়েকটি আয়াত পেশ করছি, যাতে করে এ গুরুত্বপূর্ণ শর্তের হেকমত পরিষ্কার হয়ে যায়।

বিশ্বাসে হ্রাস-বৃদ্ধি

পবিত্র কোরআন আমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা দেয় যে, অন্তরের বিশ্বাস ও একীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার নামই হলো ঈমান। আর এ অবস্থা ধীরে ধীরে জন্ম নেয়। প্রাথমিক অবস্থায় এটি দুর্বল হলে, বিভিন্ন উপায়ে জ্ঞানার্জন করে এ অবস্থাটিকে পরিপক্ক করার জন্য মানুষকে পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ ﴿١٣٦﴾

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন।"[১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً ﴿٢٠٨﴾

"হে মুমিনগণ ! তোমরা পুরোপুরি ভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।"[২]

এ আয়াত দু'টিতে সম্বোধন কাফের-মুশরিকের দিকে নয়, বরং মুমিনের দিকেই করা হয়েছে। সাথে সাথে আয়াত দু'টিতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ঈমানের এমন একটি স্তর রয়েছে, যার সাহায্যে তোমরা কুফরী থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ করতে পার। তেমনি ভাবে ঈমানের দ্বিতীয় স্তরের সাহায্যে তোমরা মুক্তি পেতে পার, আর এটিকে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর বলে মনে করা হয়। তাই তোমরা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাক। আংশিকভাবে দ্বীন মানার পরিবর্তে পরিপূর্ণভাবে দ্বীনে প্রবেশ করো। জীবনের কিছু অংশে ধর্ম অনুসরণ করার পরিবর্তে সর্বাঙ্গে ধর্ম পালন কর। মানুষ যেভাবে দুনিয়ার পেছনে ছুটা-ছুটি করতে করতে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে ; জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে,

[১]. সূরা নিসা ৪:১৩৬
[২]. সূরা বাকারা ২:২০৮

কিন্তু তার চাহিদা কখনো শেষ হয় না, তেমনি ভাবে ﴿فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ﴾ 'তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো'[১] এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলাম ঈমানদারদেরকে এ উপদেশ দেয় যে, তারা যেন জীবনের কোন বিশেষ বিষয়ে গিয়ে থমকে না দাঁড়ায়, বরং জীবন পথের এ যাত্রার ন্যায় তাদের দ্বীন-ঈমানে উন্নতির এ সফরও জারি থাকা উচিত।

যে সব বিষয় মানুষের ঈমান আর ইয়াকীনে পরিপক্কতা সাধন করতে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং যে সব বিষয় ঈমান পরিপন্থী, সেগুলোকে ঈমানের খাতিরে পরিত্যাগ করা, ঈমানে পরিপক্কতা ও ইয়াকীনে শক্তি বাড়ানোর একটি সর্বোত্তম পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

«حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ».

"প্রত্যেক অপকর্মের মূলভিত্তি হলো দুনিয়ার লোভ-লালসা।"[২]

কিন্তু এর বিপরীতে বলা হয়েছে ঃ

«رَأْسُ الحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ».

"বিজ্ঞতার মূলভিত্তি হলো আল্লাহর ভয়।"

এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভের জন্য সূরা তাওবা'র নিম্নোক্ত আয়াতটি পর্যালোচনা করা অতীব জরুরী। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"মহান আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, এবং এর প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে বেহেশ্‌ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শত্রুদেরকে হত্যা করে এবং

[১]. সূরা বাকারা ২:১৪৮
[২]. মিশকাত শরীফ : কিতাবুর রিকাক, পৃ. ৪৪৪

www.alqurans.com

এক পর্যায়ে তারাও শত্রুদের হাতে শহীদ হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে করীমে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন, তিনি তা অবশ্যই পালন করবেন। আল্লাহর চেয়ে অধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী আর কে আছেন? অতএব, তোমরা আল্লাহর সাথে যে বিনিময় করেছ, তাতে তোমরা উৎফুল্ল থাকো। এটিই বড় সফলতা।"[১]

অতএব, এ কথা খুব ভালো ভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা এবং তাঁর রাস্তায় জান-মাল খরচ করা এ কারণে জরুরী যে, ঈমান গ্রহণের সময় আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে তাদের জান-মালের বিনিময়ে জান্নাত এবং জান্নাতের শাশ্বত ও অফুরন্ত নেয়ামত দান করবেন। তাই জান-মাল খরচ করা মুমিনদের জন্য নিছক একটি শর্ত নয়, বরং এ থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, মুসলমানরা তাদের ঈমানের প্রতিশ্রুতি পালনে কতটুকু যত্নবান।

এখানে দুই দুইটি বস্তু আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী চাওয়া হয়েছে। প্রথমতঃ জান বা নিজের জীবনকে বিসর্জন দেয়া, যে জীবনকে আমরা অনেক আদর-যত্নের মাধ্যমে লালন-পালন করে বড় করি। দ্বিতীয়তঃ ধন-সম্পদ খরচ করা। যা উপার্জন করতে আমরা রাত-দিন পরিশ্রম করি। রাতের আরাম আর দিনের বিশ্রাম পায়ে দলে যা আমরা হাসিল করি। আল্লাহর নিকট মানুষ মকবুল হওয়ার জন্য শুধু এ বিষয়টি দেখতে হবে যে, সে উপর্যুক্ত দৌলত দুটিকে কতটুকু ব্যয় করতে পেরেছে।

মানুষের প্রচেষ্টা-উদ্যোগের উদ্দেশ্য

পবিত্র কোরআন আমাদেরকে এ বিষয়েও সচেতন করে যে, মানুষের সব ধরণের ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি একটুখানি সুখ আর একটুখানি আরামের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য। ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করলে এ ধন-সম্পদই মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে এ ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলে তা মানুষের পরিণতিকে সুসজ্জিত ও মনোলোভা করার কারণ হবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿١٨٠﴾

[১]. সূরা তাওবা ৯:১১১

"যে সব লোকেরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত ধন-সম্পদে কৃপণতা করে, তারা যেন এ কৃপণতাকে তাদের জন্য ভালো মনে না করে (তা ভালো নয়), বরং তা তাদের জন্য নিতান্তই ক্ষতিকর। কেয়ামতের দিন তাদের এ ধন-সম্পদকে শৃঙ্খল বানিয়ে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।[১]

সবচেয়ে বড় কথা হলো, পবিত্র কোরআন আমাদেরকে এ হেকমত সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে বলে যে, জান হোক কিংবা মাল হোক, তা ব্যয়কারীদের প্রতিদান কখনো শেষ হয় না। বরং তা আল্লাহর কাছে চিরকালের জন্য জমা হয়ে যায়। আর মহান আল্লাহ্ সেটিকে 'করযে হাসানা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴿٢٤٥﴾

"এমন কেউ আছ, যে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে ? আর এর বিনিময়ে তিনি তাকে আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন!"[২]

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার অর্থ

এ আয়াত থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে। 'আল্লাহর রাস্তা' থেকে উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, আল্লাহর কাছে আমাদের জান-মালের প্রয়োজন আছে (নাউযু বিল্লাহ্)। মহান আল্লাহ্ আমাদেও কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾

"মহান আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, লালসাহীন।"[৩]

কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

[১]. সূরা আলে ইমরান ৩:১৮০
[২]. সূরা বাকারা ২:২৪৫
[৩]. সূরা ইখলাস ১১২:২

www.alqurans.com

"হে মানুষ ! তোমরা (সকলেই) আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী। আর মহান আল্লাহ্ হলেন ঐশ্বর্যশালী, প্রশংসিত।[১]

উপর্যুক্ত আয়াত গুলোর ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল খরচ করার অর্থ হলো, অভাবী-দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি এবং ইসলাম ধর্মের মদদ ও সাহায্যার্থে ব্যয় করা। এটিকে মহান আল্লাহ্ তাঁর উপর 'কর্জ' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সময় মতো এর পুরোপুরি ঋণমুক্তি করে দেয়া হবে। এখানে আরো একটি অনুগ্রহের কথা হলো, তিনি যে জান-মাল আমাদের কাছে চাচ্ছেন, তা তো তাঁরই দেয়া। তাঁর দেয়া জান-মাল থেকে কিছু অংশ যদি আমরা তাঁর রাস্তায় ব্যয় করি, তবে এটি আমাদের পক্ষ থেকে কোন অতিরিক্ত ব্যয় হলো না। 'গালেব' বাস্তবই বলেছেন ঃ

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

"তাঁর দেয়া জান আমি বিসর্জন দিয়েছি,
হক্ব কথা হলো, এর দ্বারা তো আদায় হলো না হক্ব।"

মুমিনের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

মুমিনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যে সব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো মুমিনদের জন্য আবশ্যকীয়।[২] অর্থাৎ, একজন মানুষকে মুমিন বলার জন্য যে বৈশিষ্ট্যগুলো কমপক্ষে থাকা দরকার, সেগুলো মুমিনের সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সে আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে। তবে পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য এগুলো ছাড়া আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিম্নে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে সে বর্ধিত বৈশিষ্টগুলোর বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে, যেগুলো প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে থাকা জরুরী। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে মুমিনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশও নেই, এবং প্রয়োজনও নেই। তবে সমাজ জীবনের দিকে

১. সূরা ফাতির ৩৫:১৫

২. তর্ক শাস্ত্রের দিক দিয়ে কোন বস্তুর সংজ্ঞা সর্বদা জিনিস (মূল উপাদান) ও ফসল (বিশেষ উপাদান) দ্বারা করা হয়। যেমন- মানুষের সংজ্ঞা দেয়া হয় বাচনিক প্রাণী। অথবা সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় মানুষকে বলা হয় সামাজিক জীব। এ সংজ্ঞায় মানুষের ঐ আবশ্যক বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করা হয়, যেগুলো কোন অবস্থাতে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। যদি এসব গুণাবলী বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব অসম্পন্ন থেকে যায়।

লক্ষ্য রেখে অতীব জরুরী দু'প্রকারের বৈশিষ্ট্য আলোকপাত করা হচ্ছে। সহজের জন্য আমরা সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য।
২. ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য।

শরীয়তের পরিভাষায় প্রথম প্রকারকে হারাম, মাকরুহ্, মন্দ, অপছন্দনীয় ইত্যাদি; এবং দ্বিতীয় প্রকারকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়।

১. নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শরীয়ত একজন মুমিনের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এবং কিছু বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ ধরণের বৈশিষ্ট্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। তবে এখানে আমি আমার আলোচনাটি 'মুমিন' শব্দমূল থেকে নির্গত শব্দাবলী এবং সেগুলোর অর্থগত গন্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখব।

মুমিন শব্দের শাব্দিক অর্থ 'নিরাপত্তা দানকারী' বলে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। এ ভাবটি মুমিনের কিছু কিছু বাস্তবিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্বও করে। কেননা, সমাজ জীবনে একজন মুমিনের অস্তিত্ব আস্থা, সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হয়। আর তার ব্যক্তিত্ব যে কোন ধরণের নেতিবাচক ও বিনষ্টকারী আচরণ থেকে পবিত্র থাকে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একটি পরিপূরক ইঙ্গিত এঁকে দেয়া হয়েছে ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾

"সকল মুমিন ভাই ভাই।"[১]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴿٧١﴾

"মুমিন নারী-পুরুষ সকলে একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, এবং অসৎকাজ থেকে বাঁধা দেয়।"[২]

১. সূরা হুজুরাত ৪৯:১০
২. সূরা তাওবা ৯:৭১

www.alqurans.com

হাদীস শরীফে মুমিনদের বৈশিষ্ট্যকে এর চেয়ে আরো পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যার অসদাচরণ থেকে তার প্রতিবেশী রক্ষা পায়নি, সে মুমিন নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ». قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : «اَلَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

"আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়; আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়; আল্লাহর কসম, সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, কে সে ব্যক্তি, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অপকর্ম থেকে নিরাপদ নয়।"[১]

একজন মুমিন যেন নিরাপত্তার বার্তাবাহক, সন্ত্রাস-দুর্নীতির নয়।

সন্ত্রাস-দুর্নীতির মূলোৎপাটন

মুমিন খোদ অন্যের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হয়। কিন্তু এটি হলো ঈমানের প্রাথমিক পর্যায়। এর উপরের স্তরটি হলো, সে সমাজ জীবনের যাবতীয় অপকর্ম, সন্ত্রাস-দুর্নীতি, নৈরাজ্য ইত্যাদির মূলোৎপাটন করার জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এবং এ যাবতীয় অসামাজিক কার্যক্রম পরিপূর্ণ ভাবে সমাজ থেকে দূর না হওয়া পর্যন্ত সে তার এ অভিযান পরিচালনা করে যায়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ

"সন্ত্রাস-দুর্নীতির মূলোৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে লড়াই করে যাও। (তোমরা লড়াই করতে করতে সমাজে এমন পরিবেশ তৈরী কর,) যাতে করে পুরো ধর্ম আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে হয়ে যায়। (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের সব আইন-কানুন তারা যেন মেনে চলে।)"[২]

---

[১]. বুখারী শরীফ ২:৮৮৯। মানুষের উপকার ও ক্ষতি সর্বপ্রথম তার সঙ্গীদেরকে প্রভাবিত করে। একারণেই কোরআনে করিমে উপদেশ দেয়া হয়েছে, ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ "সৎ ও সদয় ব্যবহার কর নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশীর সাথে" (সূরা নিসা ৪:৩৬) এ বিষয়টি বিদায় হজ্জের ভাষণে এভাবে বলা হয়েছে, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي مَقَامِكُمْ هَذَا নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু এভাবে হারাম করা হয়েছে, যেভাবে আজকের এই দিন (আরাফার দিন), এই মাস (জিলহজ), এই স্থান (মক্কা) তোমাদের ওপর হারাম। (বিদায় হজ্জের ভাষণ)

[২]. সূরা আনফাল ৮:৩৯

সন্ত্রাস-দুর্নীতির মূলোৎপাটন মুমিনদের প্রধান একটি দায়িত্ব। এ উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ অব্যাহত রাখার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদেরকে এ দায়িত্ববোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে বলেন ঃ

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

"তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অপকর্ম হতে দেখলে প্রথমে তা নিজ হাতে প্রতিহত করবে। যদি তা সে নিজ হাতে প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, তবে মুখে সেটিকে প্রতিহত করবে। আর যদি সে মুখেও প্রতিহত করতে না পারে, তবে সেই অন্যায়টিকে সে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করবে। আর (হাত বা মুখে প্রতিরোধ গড়ে না তুলে কেবল) অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা হলো সর্বনিম্ন স্তরের ঈমান।"[১]

২. ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য

সন্ত্রাস-দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুমিনদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণ হয় যে, একজন মুমিনের কাজ হলো নিজে স্বয়ং অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যান্যদেরকে বাঁচানো। এখন এ বিষয়টির দ্বিতীয় প্রান্তের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় অন্যান্যদের সাথে মুমিনদের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ কোন পর্যায়ের হওয়া উচিত।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার আবেগ

জন্মগতভাবে মুমিনগণ ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার অনুভূতিতে উন্মাদ থাকে। কেননা, পবিত্র কোরআন মজীদের ঘোষণা হলো, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই"।[২] এ কারণে স্বভাবতই মুমিনদের মন-মস্তিষ্কে অন্যের উপকার, শান্তি এবং সহানুভূতির মানসিকতা ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। এর ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«اَلدِّيْنُ اَلنَّصِيْحَةُ».

"ধর্ম হলো পরকল্যাণ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার নাম।"[৩]

---

[১]. মিশকাত শরীফ পৃ.৪৩৬

[২]. সূরা হুজুরাত ৪৯:১০

[৩]. মুসলিম শরীফ ১:৫৪

www.alqurans.com

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, পরিপূর্ণ মুমিন সে ব্যক্তি, যার অস্তিত্ব মানবতার কল্যাণ ও পরিতুষ্টির কারণ হবে। তার জীবন-মরণ সবই হবে অন্যের উপকার ও কল্যাণের স্বার্থে। তার প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হবে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে। পুরো মানবতার জন্য তার অন্তরে দুঃখ-কষ্ট থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».

"এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য দেয়াল স্বরূপ, যার খন্ডাংশ গুলো পরস্পর মিলিত হয়ে শক্তিশালী হয়ে আছে।"[১]

অর্থাৎ, দেয়ালে যেভাবে প্রত্যেকটি ইট অন্যটির সাথে সংযুক্ত হয়ে পরস্পরের মিলনের কারণে একটি শক্তিশালী দেয়ালের রূপ ধারণ করে, তেমনি ভাবে একজন পরিপূর্ণ মুমিন অন্যের জন্য নির্ভরতার প্রতীক হন। এভাবে পরস্পরের সহযোগিতা ও উপকারের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার একটি মজবুত ভিত গড়ে উঠে।

ঐক্য

ভ্রাতৃত্ববোধের এ অনুভূতির কারণে মুসলমান ঐক্যের একটি মডেল হয়ে যায়। প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে নিজের পরিবর্তে অন্যের লাভ-ক্ষতিকেই আগে প্রাধান্য দেয়। কেউ তার অন্য ভাইয়ের উপর অত্যাচারের হাত বাড়ালে সে সেখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। কেউ অন্যকে কষ্ট দিতে চাইলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। এভাবে একতা ও পরস্পরের সহযোগিতায় তারা একই দেহের ন্যায় শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন ঃ

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

[১]. মুসলিম শরীফ ২:৩২১, হাদীস : ২৫৮৫ (করাচি থেকে প্রকাশিত)
শেখ সাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গুলিস্তা কিতাবে বিষয়টিকে কাব্য আকারে খুবই সুন্দরভাবে লিখেছেন,

بنی آدم اعضائے یکدیگراند کہ در آفرینش زیک جوہراند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوہارا نماند قرار
تو کز محنت دیگراں بے غمی نشاید کہ نامت نہند آدمی

"মুমিনের দৃষ্টান্ত আদর-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতায় এমন একটি দেহের ন্যায়, যখন শরীরের কোন অংশ কষ্ট অনুভব করে, তখন পুরো শরীর রাত জাগা আর জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার মধ্যে তার সঙ্গ দেয়।"[১]

ব্যথা শরীরের যে স্থানে হোক না কেন, অস্থিরতা পুরো শরীরেই অনুভূত হয়। মুসলমানদের বেলায়ও এ ধরণের হয়ে থাকে। সে তার অপর ভাইয়ের সুখে সুখী হয়, এবং ব্যথায় ব্যথিত হয়। 'আমীর মীনায়ী' এ ভাবটিকে ছন্দে ছন্দে কতই না আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر
سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

"খঞ্জরের আঁচ পড়লে কারো গায়ে,
ব্যকুল হয়ে পড়ি আমি 'আমীর'।
লালন করি মোর হৃদয়ে,
আর্তনাদ জাহানবাসীর।"

আত্মবিসর্জন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

"আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিজের জন্য পছন্দ করো, তা তোমার অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করার মানসিকতা তোমাদের মধ্যে যতদিন জন্মাবে না, ততদিন তোমরা (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না।"[২]

আমি মনে করি, এ হাদীসটি ঈমানের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উভয় স্তরের চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিচ্ছে। যদি হাদীসটির ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়, حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "তোমরা যা নিজের জন্য পছন্দ করো, তা তোমার অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করার মানসিকতা তোমাদের মধ্যে যতদিন জন্মাবে না," তাহলে এটি ঈমানের সর্বনিম্ন স্তরকে বুঝাচ্ছে। এমতাবস্থায় এর ভাবার্থ দাঁড়াবে, যে সুখ-শান্তি তুমি নিজের জন্য বেছে নিচ্ছ ; যে আরাম-আয়েশ তোমার কাছে প্রিয়, সেটি তোমার অন্য মুসলমান ভাইদের জন্যও পছন্দ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

[১]. মুসলিম শরীফ ২:৩২১, হাদীস : ২৫৮৬
[২]. বুখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান, ১:৬

www.alqurans.com

যদি হাদীসটির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করা হয়, তবে এটি ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরকে বুঝাবে। ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ ঃ

"তোমরা যা নিজের জন্য পছন্দ করো, তা তোমার নিজের জন্য পছন্দ না করে অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য যতক্ষণ পছন্দ না করবে,"

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোন মানুষ নিজের আরাম-আয়েশ, ধন-সম্পদ এবং সকল প্রিয় বস্তু অন্যকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সে মুমিনই হতে পারবে না।

সর্বনিম্ন স্তরের ঈমানে মানুষ তার পছন্দের বস্তুটি সে খোদ এবং অন্যরা সহ ভোগ করতে পারার অবকাশ ছিল। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের ঈমানে মানুষ তার জন্য যেটি পছন্দ করে তা নিজে ভোগ না করে অন্যকে ভোগ করার অধিকার নিশ্চিত করবে। অর্থাৎ, সর্বনিম্ন স্তরের ঈমানে নিজেকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যদেরকেও সেটি ভোগ করতে দেওয়ার অবকাশ ছিল, কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরের ঈমানে নিজের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেবে, নিজের স্থান আসবে অন্যদের পরে। যে স্তরে যাওয়ার সুবাদে নিজের সকল সুযোগ-সুবিধাকে অন্যদের খাতিরে বিসর্জন দেয়া হয়, সেখানে ঈমান পরিপূর্ণতার রূপ পায়। ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর মানুষকে আত্মবিসর্জনের উচ্চ আবেগের দিকে দিকনির্দেশনা দান করে। এটি আত্মবিসর্জনের সেই স্তর, যেটি মানুষকে খোদ ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত থেকে অন্যকে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দেওয়ার মাধ্যমে অফুরন্ত নেয়ামত হাসিল করার তালীম দেয়। যেটিকে সূরা হাশরে এভাবে অনুমোদন দেয়া হয়েছে ঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ ﴿٩﴾

"স্বয়ং তাদের অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়।"[১]

এ আবেগের ভিত্তিতে ইয়ারমূক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ মৃত্যুক্ষণেও নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার উদাহরণ পেশ করে মহান মুমেনী কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।[২]

---

[১]. সূরা হাশর ৫৯:৯

[২]. ঘটনা এই যে, আবু জাহম বলেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধকালীন সময়ে স্বীয় চাচাত ভাইয়ের সন্ধানে বের হলাম এবং সাবধানতা বশতঃ পানির একটি পাত্র সাথে নিলাম। সন্ধান করকে করতে যখন ভাইয়ের নিকট পৌঁছালাম, তখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হল। সে পানির জন্য আওয়াজ দিল। আমি পাত্র হতে বের করতে ছিলাম। এ মুহূর্তে তৎসন্নিকটস্থ হেশাম নামক একজন আহত ব্যক্তি পানির জন্য আওয়াজ দিল। আমার চাচাত ভাই হাতে ইঙ্গিত দিয়ে তাকে পানি পান করানোর জন্য বলল। আমি তখনো তাকে পানি পান করাইনি, তৎক্ষণাৎ আরেকজন আহত ব্যক্তি ডাক দিল। হেশাম ইঙ্গিত করে বলল, প্রথমে তাকে পানি পান করাও। যখন আমি তার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সে শাহাদতবরণ করল। ফিরে হেশামের নিকট গিয়ে দেখলাম

জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, জীবনের সে মুহূর্ত গুলোতে সাহাবাগণের সেটি কোন ধরণের আবেগ ছিল, যা তাঁদের মুখে পানি দেওয়ার পরিবর্তে অন্যদের মুখে দেওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে?

তিনজন ঘুরে আসার পরও সে পেয়ালাটি কেউ পান করতে পারলেন না! কিন্তু অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার সে শিক্ষাটি তাঁদেরকে এমন অনন্ত-অসীম প্রশান্তি দিয়েছে, যা শত পেয়ালা পান করার পরও অর্জিত হতো না। জীবন এবং ধন-দৌলত সবই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মুমিনদের এ আবেগ এবং এর প্রভাব দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে অনন্ত-অফুরন্ত।

যখন মানুষের নিকট নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে অন্যের জীবন বাঁচানোর আকাঙ্ক্ষা পয়দা হয়ে যায়, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নিজের পানি দ্বারা অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়, সেই উদ্বেগের মুহূর্তে কামেল ঈমানের ঝলক দেখা দেয়।

এটি ছিল সেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর নিকট পেশ করেছেন। এ আবেগ যদি আজ আমাদের মনের মণিকোটায় স্থান পেয়ে যায়, আমাদের সমাজ জীবনে এটি প্রসারতা লাভ করে, তাহলে আমাদের ভাগ্য হবে উজ্জ্বল। পবিত্র কোরআনের আলোকে পর্যালোচনা করলে এ চিন্তাধারার একটি চমৎকার ফলাফল আমরা দেখতে পাই ঃ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ
عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ
خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ
ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿١١﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ

সেও শাহাদতবরণ করল। সেখান থেকে আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট গিয়ে দেখলাম সেও আল্লাহর নিকট চলে গেল। (তাবারী)

www.alqurans.com

إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। তাই (ঝগড়া-ঝাটির অবসান ঘটিয়ে) দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা রাহমত প্রাপ্ত হও। হে মুমিনগণ! কোন ব্যক্তি বা গোত্র অপর ব্যক্তি বা গোত্রকে যেন উপহাস না করে। (কেননা,) সেই উপহাসকারীর চেয়ে উপহাসকৃত ব্যক্তি উত্তম হতে পারে। তেমনিভাবে মেয়েরাও যেন অন্য মেয়েদেরকে উপহাস না করে। (কেননা,) সেই উপহাসকারীনীর চেয়ে উপহাসকৃতা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে খোঁটা দিওনা, ভর্ৎসনা করো না। এবং একে অপরকে ব্যাঙ্গাত্মক নামে নামকরণ করো না। একজন মুসলিমকে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা কত যে মারাত্মক গুনাহ্! যে ব্যক্তি (তার অপরাধ স্বীকার করে) তাওবা করবে না, সেই যালিম, সীমালঙ্ঘনকারী। হে মুমিনগণ! তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাক। অনেক সময় কুধারণা গুনাহর কারণ হয়। তোমরা একে অপরের দোষ খোঁজাখোঁজি করো না। একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? (কখনো না,) বরং তোমরা তা অপছন্দ করবে। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।[১]

উপর্যুক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ মুমিনদের জন্য নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো অবধারিত করে দিয়েছেন ঃ

১. পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা।
২. ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটিয়ে মীমাংসা করে দেয়া।
৩. খোদা ভীতি পয়দা করা।
৪. কাউকে উপহাস না করা।
৫. খোঁটা-ভর্ৎসনা থেকে বিরত থাকা।
৬. কাউকে ব্যাঙ্গাত্মক নামে সম্বোধন না করা।
৭. কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ না করা।

[১]. সূরা হুজুরাত ৪৯:১০-১২

৮. দোষ খোঁজাখোঁজি না করা।
৯. গীবত না করা।

হাদীস শরীফের মধ্যেও মুমিনদের বিভিন্ন গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

١- «وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ».

"যে ব্যক্তির মাধ্যমে অন্য মুমিনদের জান-মাল নিরাপদে থাকে সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন।"[১]

٢- «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ».

"একজন মুমিন অন্য মুমিনের ভাই। একজন মুমিনের জন্য অন্য মুমিন কর্তৃক ক্রয়কৃত দ্রব্য ক্রয় করা হালাল হবে না। (এমনকি) এক মুমিনের দরকষাকষির উপর যেন অন্য মুমিন দরকষাকষি না করে; যতক্ষণ না সে (সেই বস্তুর ব্যাপারে) দরকষাকষি বন্ধ করে দেয়।"[২]

٣- «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا».

"যে ব্যক্তি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী, সে কামেল মুমিন।"[৩]

٤- «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حُقُوقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : أَلاَ لَهُ فِي عَيْنِهِ ، وَالْوُدُّ لَهُ فِي صَدْرِهِ ، وَالْمَوَاسَاةُ لَهُ فِي مَالِهِ ، وَأَنْ يَحْرُمَ غِيْبَتَهُ ، وَأَنْ يَعُوْدَ فِي مَرْضِهِ ، وَأَنْ يَشْيَعَ جَنَازَتَهُ ، وَأَنْ لاَّ يَقُوْلَ فِيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ خَيْرًا».

"আল্লাহ্ তাআলা একজন মুমিনের উপর অন্য মুমিনের জন্য সাতটি হক্ব ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এক. তাকে সম্মান দিবে। দুই. অন্তরে তার ভালোবাসা থাকবে। তিন. তার অর্জিত অর্থ-সম্পদের কিছু অংশ তাকে দান করবে। চার. তার গীবত করা হারাম মনে করবে। পাঁচ. অসুস্থ হলে তার সেবা করবে। ছয়. তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে।

[১]. নাসায়ী ২:২৩০
[২]. মুসলিম শরীফ ১:৪৫৪
[৩]. মিশকাত শরীফ পৃ. ৪৩৩

www.alqurans.com

সাত. তার মৃত্যুর পর কেবল তার ভাল দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।"[১]

٥- «مَنْ وَاسَى الْفَقِيْرَ مِنْ مَالِهِ وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَالِكَ الْمُؤْمِنُ حَقًّا».

"যে ব্যক্তি ফকীরকে নিজের অর্থ-সম্পদ দান করে এবং মানুষের সাথে ন্যায়-পরায়ণতার সাথে আচরণ করে, সে প্রকৃত মুমিন।"[২]

٦- «اَلْمُؤْمِنُ مِرْأَةُ الْمُؤْمِنِ إِذَا رَأَي فِيْهِ عَيْبًا أَصْلَحَهُ».

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। যখন সে তার অপর মুমিন ভাইয়ের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি দেখে, তখন সে তা সংশোধন করে দেয়।"[৩]

٧- «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

"যাঁর হাতে আমার জান রয়েছে, তাঁর (আল্লাহর) কসম, একজন মুমিনকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করার চেয়েও জঘন্যতম।"[৪]

٨- «اَلْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ».

"স্বয়ং একজন মুমিন একটি দলের সমতুল্য।"[৫]

যাই হোক, পবিত্র কোরআন হাদীসের আলোকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুমিন একে অপরের ভাই। তারা একজন অন্যজনের হাত-বাহুর ন্যায়। তাদের পরস্পর মিলেমিশে জীবন যাপন করা উচিত। তারা পরস্পর সম্মান প্রদর্শন করবে। অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবে, আর সুখে সুখী হবে। গীবত, দোষ খোঁজাখোঁজি ও অন্যের সামাজিক দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়বে না। একজন মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন অন্য মুমিনের প্রেম-ভালোবাসার কারণ হয়। কখনোই যেন তার জন্য কষ্টের কারণ না হয়।

যদি আমরা এ সকল বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান হই, তবে আমরা প্রকৃত মুমিন। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মান্যকারী

১. ইবনে বাবুয়াহ (মিনহাজুস সালেহীন'র বরাত দিয়ে উল্লেখিত পৃ. ৯)
২. তহাবী শরীফ। (মিনহাজুস সালেহীন'র বরাত দিয়ে উল্লেখিত।)
৩. বুখারী শরীফ। (মিনহাজুস সালেহীন'র বরাত দিয়ে উল্লেখিত।)
৪. নাসায়ী ২:১৪৫
৫. তহাবী শরীফ। (মিনহাজুস সালেহীন'র বরাত দিয়ে উল্লেখিত।)

হিসেবে গণ্য হবো। আমরা ঐক্য-ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা গঠন করতে পারবো। অন্যথায় আমাদের ঈমানের দাবি কেবল কাথাবার্তার অন্তঃসারশূন্য নিষ্কর্মা কতগুলো আওয়াজ বলে পরিগণিত হবে।

www.alqurans.com

তৃতীয় অধ্যায়

ঈমানের আদব

ঈমান ও ইসলামের প্রকৃতি-হাকীকত এবং মুমিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এবার আমি 'ঈমানের আদব' শিরোনামে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। এতে করে ঈমানের দাবিগুলোকে কোরআন-হাদীসের আলোকে আমরা যথাযথভাবে জানতে পারব। পবিত্র কোরআন, ঈমানের দাবিগুলোকে অত্যন্ত বাগ্মীতাপূর্ণ ও বড় বিজ্ঞতাসুলভ ভাষায় বর্ণনা করেছে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ ﴿١٣٦﴾

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আন। সাথে সাথে যে গ্রন্থটি তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন, সেটির উপরও ঈমান আন।"[১]

এ আয়াতে ঈমানদারদের প্রতি সম্বোধন করে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ঈমানদারগণের প্রতি ঈমান আনার এ নির্দেশ, কী হেকমত আর দর্শন বহন করছে? এ কথাটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য আমি এ অধ্যায়ে ঈমানের আদব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব।

উপর্যুক্ত আয়াতটির ভাবার্থের দিকে গভীরভাবে তাকালে আমাদের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ঈমান কেবল স্বাভাবিকভাবে মুখে স্বীকার এবং আকীদাগতভাবে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম নয়, বরং আরো অগ্রসর হয়ে সেই নিয়ম-কানুনগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণ করে নেয়া, যেগুলো ব্যতীত সেই মহান বিপ্লব মানব জীবনে পরিলক্ষিত হতে পারে না, মানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলাম যে বিপ্লবের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। যার বাস্তব উদাহরণ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনগণের যুগে দেখতে পাই। এখানে এ কথাটি ভালোভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লাহ্, তাঁর প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু

[১]. সূরা নিসা ৪:১৩৬

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ পবিত্র গ্রন্থের উপর ঈমান আনা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু বাস্তবে নিজেকে মুমিন বানিয়ে দেখানো কঠিন একটি কাজ। আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কতই না সুন্দর বলেছেন ঃ

چوں می گویم مسلمانم بلرزم
کہ دانم مشکلات لا الہ را

মুখে যখন বলি আমি মুসলমান
জ্ঞাত হই লা-ইলাহার কঠিন বাস্তবতা তখন।

ঈমানী দাওয়াতের দর্শন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্, তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আসমানী গ্রন্থের উপর ঈমান আনার নির্দেশ আপেক্ষিক দৃষ্টিতে কিছু দাবি রাখে। এগুলোকে পুরো করা ঈমানের জন্য আবশ্যক বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমান যেন শুধুমাত্র নিয়মরক্ষা ও প্রকাশ্য দেখানোর খাতিরে না বনে যায়, বরং এর প্রভাব ভিতরে এমনভাবে সংক্রমণ করতে হবে, যাতে করে একজন মুমিনের উঠা-বসা, ঘুম-জাগরন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি জীবনের সকল কার্যকলাপে ইসলামের দৌলত ও ঈমানের আলো যেন প্রজ্জলিত হতে থাকে এবং ঈমান তার পরিপূর্ণ রূপ পায়। ঈমান তার পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করার জন্য কি কি শর্ত পূরণ করতে হবে এবং কি কি নিয়ম পালন করা জরুরী, এর উপর দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এখানে আমি শুধুমাত্র ঈমানের তিনটি আদব বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো।

ঈমানের তিনটি আদব

ঈমানের যে তিনটি আদব পালন করা একজন মুমিনের জন্য অতীব জরুরী, সেগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি, যাতে করে কোন্‌টি ঈমান আর কোন্‌টি ঈমান নয়, তা ভালোভাবে জানতে পারি।

প্রথম আদব

ঈমানের সর্বপ্রথম আদব হলো, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর জীবনকে এমন একটি পরিপূর্ণ একক মনে করতে হবে, যার অংশগুলো পরস্পর পৃথক (Inseparable) নয়। ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আন্তরিক বিশ্বাসের পর মুমিনের অত্যাবশ্যকীয় কাজ হলো, সে তার জীবনের সকল কার্যক্রমে ইসলামের বিধানকে এমন ভাবে প্রয়োগ করবে, যেন তার জীবন পুরোপুরি ভাবে ইসলামের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে যেন এমন কোন ফাঁক ফোকর থেকে না যায়, যেখানে কুফরী রীতি-নীতি জাল বুনতে পারে। ইসলাম গ্রহণের পর এমন স্বাধীন হওয়া উচিত নয় যে, জীবনের এক অংশ ঈমান এবং অপর অংশ কুফরী রূপ ধারণ

www.alqurans.com

করে। এ সুরতহাল ঈমান এবং কুফর একত্রিত হবার ইঙ্গিত বহন করে, যেটিকে পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় মুনাফেকী বা কপটতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব, ঈমানের প্রথম আদবের দাবি হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈমানকে পুরোপুরি ভাবে প্রয়োগ করা। এর কোন অংশে যেন কুফরীর কালিমা না পড়ে। জীবনের কোন অংশ যেন ঈমান ও ইসলামের সংশ্রব সংক্রমণ হওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সামনে উপস্থাপিত হবে।

দ্বিতীয় আদব

ঈমানের দ্বিতীয় আদবের দাবি হলো, কোরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন, আমরা ভুলেও সেগুলোর কাছে যাব না।

পুরো জীবনে হালাল-হারামের পার্থক্য এমন ভাবে কার্যকরী করতে হবে যে, কুফর এবং মুনাফেকীর কোন রেশও যেন অবশিষ্ট না থাকে। পার্থিব জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ ইসলামী শিক্ষার ধারায় এমন ভাবে পরিচালিত করতে হবে, যেন যাহির-বাতিন উভয়ের মধ্যে স্ববিরোধিতা এবং কুফরীর সাথে সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত না হয়। এটি ঈমানের দ্বিতীয় আদব।

তৃতীয় আদব

ঈমানের তৃতীয় আদব হলো, এ বিষয়টি অনুসন্ধান করা যে, যে মতাদর্শের উপর পুরো জীবনকে পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেটি কোন ধরণের ইসলাম? ইসলাম কি মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা সমর্থিত এমন কোন ভিত্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাপকাঠি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বার্থে সর্বদা পরিবর্তনশীল?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরিদ্রতা ঈমানের উৎস

এটি একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা যে, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনা অসম্পূর্ণ তথা সীমাবদ্ধ। অতএব, মানবের চিন্তা-পরিকল্পনার মাধ্যমে আবিষ্কৃত কোন ইসলাম গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সমগ্র মানবতার প্রতি প্রেরিত ইসলামই কেবল গ্রহণযোগ্য। এই ইসলামের অবয়ব এবং এর আমলী কাঠামো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শের আয়নায় ঝলমল করতে দেখা যায়। অতএব, ঈমানের অবিসংবাদিত ও সর্বকালীন মাপকাঠি এটিই সাব্যস্ত হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শে যে মতাদর্শ অবলম্বনের চিত্র আমরা দেখতে পাই, তা প্রশ্নাতীত ভাবে, মুক্ত মনে, ঈমান মনে করে গ্রহণ করে নিতে হবে। আর যে সব মতাদর্শ সুন্নতের সাথে সাংঘর্ষিক দেখা দিবে, সেগুলোকে

কুফর মনে করে পরিত্যাগ করতে হবে। কুফর এবং ঈমানের গ্রহণীয়-বর্জনীয় এ মাপকাঠিকে নিজের আমলী জীবনে বাস্তবায়ন করাই হলো ঈমানের তৃতীয় নম্বর আদবের মৌলিক শর্ত। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, ইসলামের উপস্থাপিত ভালো-মন্দের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসত্ব ও আনুগত্যের মধ্যে মঙ্গল, আর অস্বীকার ও অবাধ্যতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে অমঙ্গল।

ঈমানের আদব সংক্রান্ত উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্ম হলো, প্রথম আদব, পুরো জীবনকে ইসলামের গন্ডির আওতাধীন করে নেওয়ার দাবি রাখে; দ্বিতীয় আদব, যাহির-বাতিনে ইসলামকে পরিপূর্ণ রূপে সংক্রমণ করার দাবি রাখে এবং তৃতীয় আদব, ঈমান-কুফর, হক-বাতিল এবং ভালো-মন্দের মাপকাঠিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও জীবনাদর্শ থেকে চয়ন করে পুরো জীবন ব্যবস্থাকে সেই অনুযায়ী পরিচালনা করা। ঈমানের এ আদব গুলোকে যথাযথ ভাবে পালন করার নির্দেশ প্রথমে উল্লেখিত আয়াতে দেয়া হয়েছে।

ঈমানের পরিচয়

মৌখিকভাবে ঈমানের স্বীকৃতি এবং আকীদাগত ভাবে অন্তরে তার বিশ্বাস স্থাপনের দাবির মাধ্যমে এ বিষয়টি যাচাই করে দেখা উদ্দেশ্য যে, ঈমানের স্বীকারোক্তি ও বিশ্বাসের পর ইসলাম যে পর্যায়ের বিপ্লব তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়, সেটি বাস্তবায়িত হয়েছে কি হয়নি। যদি তোমাদের জীবন সেই বিপ্লবের সাথে পরিচিত হয়ে যায়, তবে নিঃসন্দেহে এর প্রভাব তোমাদের ভিতরে-বাইরে ফুটে উঠবে। তোমাদের জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে যাবে। যদি ইসলামের পরেও তোমাদের জীবনে কুফর-মুনাফেকীর সেই রুক্ষতায় ছেয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো, ঈমানের নামধারী স্বীকারোক্তি ও বিশ্বাসের দাবি সঠিক নয় ; এবং তোমাদের কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। মহান আল্লাহ্ তোমাদের এ নামধারী ঈমানের দাবি নয়, বরং সেই বাস্তবিক ঈমানকেই দেখতে আগ্রহী, যা তোমাদের বাস্ত ব আমলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কবি গালিব বলেন ঃ

رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل
جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے

শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হলে নয়,
চোখের অশ্রু হয়ে পড়ে রক্ত হয়।

www.alqurans.com

স্বাধীনতা অর্পণ করেননি। মানুষের জীবনে এমন অগনিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, যেগুলোকে মানুষ তাদের নিজ ইচ্ছা বলে বাধা দিতে পারে না। বরং পরিস্থিতির ভয়াবহতার সামনে আত্মরক্ষার যাবতীয় হাতিয়ার তারা হাত থেকে ফেলে দিতে বাধ্য হয়ে যায়। এ কারণে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদের জীবনকে আল্লাহর জন্য নিবেদন করে। জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁর সন্তুষ্টির অধীনে করে দেয়। একই ভাবে যে মৃত্যুতে তাদের কোন ক্ষমতা চলেনা, সেটিকেও যেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর ছেড়ে দেয়। জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে এ পন্থা অবলম্বন করার সুবাদে মানুষ সন্তুষ্টির সেই স্থানে গিয়ে উপনীত হয়, যেটি কবি ইকবাল রাহমতুল্লাহি আলাইহির ভাষায় ঃ

ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

'বেঁচে থাকা' হয় কখনো জীবন,
কখনো বা মৃত্যুতে।

এ ধারণার জন্ম দেয়। এ ধারণায় মৃত্যুর সমাপ্তি চিরস্থায়ী জীবনের সাথে মিলিত হয়। সেই মহান সত্ত্বা এতই মেহেরবান, উদার এবং দানশীল যে, মানুষ করতে অক্ষম এ ধরণেরও কোন কাজের সামান্যতম ইচ্ছা যদি মানুষ পোষণ করে, তবে সেটিতে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা তিনি মানুষকে প্রদান করেন। এ অনুভূতিকে মনে-প্রাণে দৃঢ় ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে মুমিনের অন্তর থেকে মৃত্যুর ভয় খানিকটা হ্রাস পায় ; এবং মহান আল্লাহর ভয় ব্যতীত দুনিয়ার কোন ভয় তার সামনে বাঁধ সাজতে পারে না। এর ফলে জীবনের প্রতিটি পদে পদে সম্মুখিত প্রত্যেকটি আশংকার বিরুদ্ধে জানবাজ মুকাবিলার সাহস অর্জিত হয়। সেটি যতই ভয়াবহ পরিস্থিতি হোক না কেন, সেটির সামনে সে কখনো হাতিয়ার নত করে না।

দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে তারতম্য

ধর্মকে কেবল মসজিদের চার দেয়ালের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ করে রাখা এবং মসজিদের বাইরের জীবনকে দুনিয়াবী কার্যকলাপ বলে মনে করা একটি মারাত্মক ভুল। নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, ওমরা এবং দান-সদকাকে দ্বীনদারী এবং অন্যান্য কার্যকলাপকে দুনিয়াদারীর ভাগে বন্টন করে দেওয়ার দ্বারা দ্বীনের তাৎপর্য উপেক্ষিত হয়। এর সামাজিক ও বৈশ্বিক অবদানে আঘাত আসে। আমরা কেবল নামায-রোযা এবং অন্যান্য ইবাদতকে দ্বীন এবং দৈনন্দিন জীবনের শতশত কার্যক্রম, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য দুনিয়াবী কার্যকলাপকে দ্বীনের বাইরের অংশ বলে ধারণা করি, এটি আমাদের দুর্ভাগ্য নয় তো আর কি ! দ্বীন-দুনিয়ার এ বন্টনের দ্বারা আমাদের জীবনের বিভিন্ন অংশ (Compartments) দুর্বল হয়ে গেছে, কুঁচকে গেছে। দ্বীন-দুনিয়ার মধ্যে এ তারতম্যের অনুমতি জিঁইয়ে রেখে আমরা পৃথক পৃথক

মাপকাঠি কায়েম করে ফেলেছি। মসজিদে কিংবা কোন দ্বীনী অনুষ্ঠানস্থলে দ্বীনের কথা হয়, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, বিয়ে-শাদী অথবা অন্য কোন কার্যকলাপের বেলায় ধর্মকে আলমিরার তাকে গুছিয়ে রেখে আমরা দুনিয়াদারীতে মত্ত হয়ে যাই। আমাদের অদূরদর্শী ও কুধারণার উপর ভিত্তি করে আমাদের বাস্তব জীবনে ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নিতে আমরা অস্বীকার করেছি। অথচ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানাবলীর দৃষ্টিকোণে, ইসলামে দ্বীন ব্যতিরেকে দুনিয়াবী কোন কার্যকলাপ কল্পনাই করা যায় না। ইসলামী মতাদর্শে দ্বীন এবং দুনিয়া পরস্পর এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, পরস্পরকে পৃথক করার দরুণ ধর্মের মর্যাদা-অবদান অক্ষত থাকে না। এতে করে আবশ্যকীয় ভাবে সেই উচ্চাকাঙ্খা ও কামনা-বাসনার রাজত্ব কায়েম হয়, যেটির দিকে ইঙ্গিত করে কবি ইকবাল রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন

ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی
ہوس کی امیری ہوس کی وزیری

দ্বীন-দুনিয়ার মাঝে সেজেছে ফারাক যে মন্ত্র,
কামনার বাদশাহী বাসনার উযিরী।

দ্বীনের বিভিন্ন শাখা

মানুষের পুরো জীবনের যে কোন পর্যায়ে সংঘঠিত অতি নগন্য ব্যাপারগুলোও ধর্মের গন্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ। জীবনের প্রতিটি ব্যাপার থেকে কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করার জন্য দ্বীনের বিভিন্ন শাখা বিদ্যমান রয়েছে। যাতে করে পদ্ধতিগতভাবে (Methodical), সুশৃঙ্খল ভাবে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এর অংশ হিসেবে দ্বীনের নিম্নোক্ত শাখাগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

আকাইদ শাস্ত্র

আকাইদ ও মতবাদের যে পূর্ণাঙ্গ নিয়ম নীতির আওতায় মানুষের মনুষ্যত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ যে সকল ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ অন্তর্ভূক্ত, তাকে 'ইলমুল আকাইদ' বা 'আকাইদ শাস্ত্র' হিসেবে নামকরণ করা হয়। আমাদের জীবনের সকল কার্যকলাপের যে ভিত্তির উপর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত, তা 'ইলমুল আকাঈদ'।

শিষ্টাচারগত বিধানাবলী

আমাদের উঠা-বসা, মেলা-মেশা, পানাহার, সুখ-দুঃখ, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যে অগনিত সামাজিক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলীকে ইসলামী

www.alqurans.com

শরীয়তের পরিভাষায় 'আহ্কামুল আদব' বা 'শিষ্টাচারগত বিধানাবলী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

বিবাহ সম্পর্কিত বিধানাবলী

বিয়ে-শাদী, তালাক-ডিভোর্স, শিশু জন্ম ও তাদের শিক্ষা-শাসন, পারিবারিক জীবন এবং এ থেকে জন্ম নেয়া অসংখ্য মাসআলা, যেমন- মৃত্যু, অসিয়ত, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি ইত্যাদির বিধানাবলী 'আহ্কামুল মুনাকিহাত' বা 'বিবাহ সম্পর্কিত বিধানাবলী' এর অন্তর্ভূক্ত।

ধন-সম্পদ সম্পর্কিত বিধানাবলী

কারবার-ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়িক লেনদেন, ধন-সম্পদ উপার্জন এবং ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক কার্যকলাপ 'আহ্কামুল মালিয়্যাত' বা 'ধন-সম্পদ সম্পর্কিত বিধানাবলী' এর অন্তর্ভূক্ত।

চুক্তি-মৈত্রী সম্পর্কিত বিধানাবলী

পরস্পর আলোচনার ভিত্তিতে সম্পাদিত হওয়া উৎপাদন-বন্টন, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং এ জাতীয় যে কোন ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি বাস্তবায়ন কিংবা বাতিল করণ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যকলাপ 'আহ্কামুল মুআহাদাত' বা 'চুক্তি-মৈত্রী সম্পর্কিত বিধানাবলী' এর অন্তর্ভুক্ত।

শাস্তি সম্পর্কিত বিধানাবলী

অপরাধ এবং অপরাধীর শাস্তি, যেমন- কারাগারে বন্দী করে রাখা, বেত্রাঘাত করা, জরিমানা, মৃত্যুদন্ড ইত্যাদি সম্পর্কে শরীয়তে বিস্তারিত বর্ণনা বিধৃত রয়েছে। অপরাধ এবং অপরাধীর শাস্তির সকল নীতিমালা 'আহ্কামুল উকুবাত' বা 'শাস্তি সম্পর্কিত বিধানাবলী' এর অন্তর্ভূক্ত।

সরকার সম্পর্কিত বিধানাবলী

সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রাজনীতি পরিচালনা ও সার্বিক কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য সরকার এবং নেতৃত্ব গঠিত হয়। এর আওতায় রাজা-প্রজাদের পরস্পর সম্পর্ক, তাদের মাঝে অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারণ, নেতৃত্বের বিভিন্ন অংশের (Organs), দায়িত্ব (Functions), ক্ষমতা (Powers) এবং এ ধরণের যাবতীয় কার্যকলাপ 'আহ্কামুস সুলতানিয়্যাহ্' বা 'সরকার সম্পর্কিত বিধানাবলী' এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধানাবলী

শান্তিপূর্ণ এবং যুদ্ধাবস্থায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে দ্বি-জাতিক (Bilateral) কিংবা বহুজাতিক (Multilateral) সম্পর্ক, সীমান্ত বিরোধ, পরস্পর মীমাংসাধীন

চুক্তি, যুদ্ধে গ্রেপ্তারকৃত সৈন্য সম্পর্কে সকল বিধি-বিধান ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমঝোতা এবং জাতিসংঘের (U.N.O) সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যকলাপ 'দূতিয়ালি সংক্রান্ত বিধানাবলী' এর অন্তর্ভূক্ত।

অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিধানাবলী

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম সংখ্যালঘুর সাথে সম্পর্ক এবং তাদের সাথে আচরণ (Dealing) সংক্রান্ত বিধি-বিধান ইসলামী শরীয়তে 'আহ্কামে আহলুয যিম্মাহ্' বা 'অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্পর্কিত বিধানাবলী' এর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখাকে অন্তর্ভূক্ত করে

জীবনের কোন একটি শাখা এবং দিক, সেটি ব্যক্তিগত হোক কিংবা সামাজিক হোক, জাতীয় হোক কিংবা আন্তর্জাতিক হোক; অথবা সেটি ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, শান্তি-নিরাপত্তা এবং যুদ্ধ-সন্ধি যেটিই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই সেটি ইসলামী নিয়ম-নীতির বাইরে নয়। ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত পুরোজীবন একীভূত, এবং সামগ্রিকভাবে ধর্ম জীবনকে এমনভাবে অন্তর্ভূক্ত করে যে, সেটির কোন অংশকে পূর্ণাঙ্গ একক থেকে পৃথক করা অসম্ভব। মানুষের উঠা-বসা, চলা-ফেরা এবং রাত-দিনের কোন মুহূর্ত এমন নেই, যেটি দ্বীনের সাথে পুরোপুরিভাবে সম্পর্ক রাখে না। কিন্তু, অতি দুঃখজনক ব্যাপার হলো, আমরা বাজারে-মার্কেটে ব্যবসা করার সময়, বিয়ে-শাদীতে, এক কথায় মসজিদের বাইরে সংঘটিত সকল কার্যকলাপে দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখি না। জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে যে ইসলামী শরীয়তের বিস্তারিত বিধি-বিধান বিদ্যমান রয়েছে, তা আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না। আমরা সেগুলোর ধারে কাছেও যাই না। আজ আমাদের অনুভূতিহীনতার এ দশা যে, আমরা বুঝতেই পারছি না যে, দ্বীনী বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে আমরা ক্ষতিসাধনের উদ্ভাবক হয়ে যাচ্ছি।

واے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

যাচ্ছে খুইয়ে, যাচ্ছে খুইয়ে, রসদ কাফেলার,
ও হে হতভাগা।
নেই নেই অনুভূতি ক্ষয়ের,
যাচ্ছে ধেয়ে অন্তর থেকে তারি।

অনৈসলামি জীবনের দুঃখজনক ঘটনা

নির্মম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, আমরা পবিত্র শরীয়ত; দ্বীনে মুহাম্মদীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) টুকরো টুকরো করে ভাগ করে ফেলেছি। মহান

আল্লাহ্ আমাদেরকে যে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম দান করেছিলেন, সেটিকে আমরা পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছি। আজ আমরা এতই হতভাগা হয়ে পড়েছি যে, আমরা জীবনের বস্তুগত ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে গেছি। যেখানেই আমরা কোন বস্তুগত লাভ দেখি, সেখানে দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যাই। জন্ম, মৃত্যু, বন্ধুত্ব, শত্রুতা এবং দৈনন্দিন জীবনের কোন কার্যকলাপ দ্বীনের বাইরে নেই। আমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি ভাবে অজ্ঞাত যে, দুনিয়াবী কার্যকলাপের বিপরীতমুখী দ্বীন মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস কর্তৃক প্রবর্তিত কোন দ্বীন নয়। বরং এ ধরণের কোন দ্বীনের অস্তিত্বের কথা মানুষের কল্পনার একটি সৃষ্টি মাত্র। মানুষের পুরো জীবন প্রবাহকে যদি ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করা দ্বীনের উদ্দেশ্য না হতো, তবে আবু জেহেল, আবু লাহাব এবং মক্কার অন্যান্য মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করার কি প্রয়োজন ছিল। তারা অতি সহজে বলতে পারত যে, আপনার সাথে আমাদের কোন বিবাদ-মতানৈক্য নেই; আপনি আপনার প্রভুর ইবাদত করতে থাকবেন, আর আমরা আমাদের মূর্তিদের পূঁজা করতে থাকব। ইসলামকে কেবল ইবাদত এবং দান-সদকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে রাখলে, কুফরী জগৎ ইসলাম থেকে কী ভয় অনুভব করতে পারত? ইসলাম এবং কুফরের মাঝে প্রধান পৃথকীকরণ, যেটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমকে মক্কা নগরী থেকে হিযরত করা এবং পবিত্র দেহ মুবারককে রক্তাক্ত করতে বাধ্য করেছিল, সেটি ইসলামী বিপ্লব এবং ইসলামের শাশ্বত বাণী, أُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً "তোমরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ কর" এর ভিত্তিতে ছিল। কাজেই কোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী সকল কার্যকলাপকে পরিত্যাগ করা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনকে আল্লাহর বিধানাবলী মুতাবেক পরিচালিত করাই হলো ঈমানের প্রধান শর্ত।

বাতিল রীতি-নীতি পরিত্যাগ

ইসলাম মানবিক জীবনে এ ধরণের বিপ্লব জাগ্রত করতে চায় যে, দ্বীন এবং দুনিয়ার মধ্যে দ্বৈত নীতি এবং বৈপরিত্যের সকল পথ যেন বন্ধ হয়ে যায়। সকল কর্মকান্ডে দ্বীনের ক্ষমতা বলে জীবনের সকল বৈপরিত্য এবং দ্বীন-দুনিয়ার দ্বৈত নীতির সম্ভাবনা যেন চিরতরে শেষ হয়ে যায়। এর ফলে, শুধু হাতে গুণা কতক বিষয়ে দ্বীন অনুযায়ী আমল করা হবে এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে লাগামহীন উটের ন্যায় নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ধর্মকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেনে চলার দ্বারা বাতিল থেকে দূরে থাকা ও বাতিলকে পরিত্যাগ করার আগ্রহ জাগ্রত হয়। তখন বাতিলের কুলে জন্ম দেয়া সকল রীতি-নীতিকে ঘৃণার পায়ের নিচে পদদলিত করা সম্ভবপর হয়ে যায়।

www.alqurans.com

কী লজ্জাজনক ব্যাপার! আমরা একদিকে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ব, আবার মসজিদ থেকে বের হয়ে কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য দুনিয়াবী কার্যকলাপে ধোঁকা-বেঈমানী এবং প্রতারণাকে বৈধ মনে করব; আমাদের এ ধরণের নামাযের কারণে অমুসলিদের দৃষ্টিতে কি ইসলাম হাসি-ঠাট্টার পাত্র হচ্ছে না? আমাদের এ কর্মকান্ডগুলো কি দ্বীনকে ঠাট্টা-উপহাস করার কারণ হচ্ছে না?

ঈমান এবং ইসলামের চাহিদা হলো, যে সমস্ত বাতিল রসম-রেওয়াজ, রীতি-নীতি এবং কর্মকান্ড ধর্মের বিপরীত হবে সেগুলোকে যেন আমরা পরিত্যাগ করি এবং পার্থিব সকল কার্যকলাপে সুদ-ঘুষ, ধোঁকা-প্রতারণা, অঙ্গিকার ভঙ্গ করা, চক্রান্ত করা ইত্যাদি অপকর্ম চিরতরে পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর কাছে খাস দিলে কৃতকর্মের কারণে গুনাহ্ মাফ চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কার্যকলাপ না করার জন্য তাওবা করতে হবে। যদি আমরা আমাদের এ অপকর্ম থেকে ফিরে না আসি, এবং আমাদের নামায-রোযা, যাকাত-দান, হজ্জ-ওমরাহ্ এবং অন্যান্য নফলী ইবাদত ও দান-খয়রাত আমাদের এ গুনাহ্গুলোর কাফ্ফারা হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করে বসি, তাহলে এটি হবে আমাদের ভুল ধারণা। এতে আমরা নিজেরাই প্রতারণার শিকার হব। মহান আল্লাহ্ একদিকে যেমন করুণাময়-দয়ালু, একই ভাবে তিনি মহাপরাক্রমশালীও। দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-তামাশা তাঁর ক্রোধকে বরং আমন্ত্রণ জানায়। পবিত্র কোরআনে 'তাযকীর বিআয়্যামিল্লাহ্' বা 'মহান আল্লাহর স্মরণীয় দিবসগুলো' এর স্মরণ হিসেবে প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগগুলোতে ইহুদী, নাসারা, সালেহ্ জাতি, হুদ জাতি, নূহ্ জাতি এবং অন্যান্য নবীগণের উম্মতদের উপর আযাব আর শাস্তি প্রদানের যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা মহান আল্লাহর ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করার কারণে দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনাগুলোর বর্ণনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষণীয় হয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, সেই মহান ক্ষমতাবান আল্লাহ্ আজকের দিনেও আমাদের অপকর্মের কারণে সেই একই ধরণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। আমাদের অবস্থাও ইহুদী-নাসারাদের মতো হওয়ার কারণে এ কথার জোর দাবি রাখে যে, আমরা পূর্ববর্তী জাতির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব এবং আল্লাহর নিকট তাওবা করে সঠিক দ্বীনী শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হয়ে যাব।

ঈমানের মাপকাঠি

ঈমানের মাপকাঠি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি লক্ষ্যণীয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত শরীয়তের অধীন হয়ে যায়।"[১]

এ পবিত্র হাদীসের আলোকে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানের দাবি করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের সকল প্রবৃত্তিকে পরিহার করে পরিপূর্ণ ভাবে দ্বীনকে গ্রহণ না করে। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ভাষায় নিজের উম্মতদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, তোমাদের ভিতর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান পরিপক্ক এবং মজবুত হতেই পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রবৃত্তি-কামনা, তোমাদের ইচ্ছা এমনকি তোমাদের পুরো জীবন ধর্মের রূপ ধারণ করবে না। এখন, এটি এমন একটি পরস্পর বিরুধি ব্যাপার যে, আমরা নিজেদেরকে মুসলমানও বলছি, এবং বড় গলায় ঈমানদার হওয়ার দাবিও করছি, কিন্তু এতসব দাবি সত্ত্বেও আমরা পুরো পৃথিবীতে আজ লাঞ্ছিত-অপমানিত হচ্ছি। আমরা কি কোন দিন চিন্তা করেছি যে, কুফরীর বিরুদ্ধে প্রতিটি পদে পদে কেন আমরা পরাজয়ের মুখোমুখি হচ্ছি? আর এ অপমান আর লাঞ্ছনা কেন আমাদের ভাগ্যদেবী বনে গেছে? যদি আমরা স্বয়ং নিজেদেরকে যাচাই করি, এবং নিজেদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে আত্মসমালোচনা করি, তবে এ কথা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমাদের যাহির-বাতিনের মধ্যে মিল নেই। আমরা উপরে তো মুসলমানের রূপ ধারণ করে আছি, কিন্তু নিজেদের অন্তঃসারশূন্য কার্যকলাপ ও মন্দ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কারণে বাস্তবে ইসলামি কর্মপরিকল্পনা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করার উদাহরণ বনে আছি। কথা আর কাজে অমিল এবং ইসলামি ভাবধারা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে আমরা বাস্তবে বিশ্ব কুফরী শক্তির সাহায্য-মদদ করছি। কুফরীকে সাহায্য করা মানেই হলো ইসলামের সাথে শত্রুতা করা। মুনাফেকী ও বিপরীতমুখী কর্মকান্ডের কারণে কাফেরদের তুলনায় আমরা বরং ঢের বেশী ইসলামের ক্ষতি করছি। এখন আমাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, আমরা এক পা ইসলামের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছি এবং অন্য পা বাড়িয়ে দিয়েছি কুফরীর দিকে।

ناطقہ سر بگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের নিজেদের কার্যকলাপগুলোকে ধারাবাহিক ভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। কেবল নামধারী মুসলমান না হয়ে কোরআন-সুন্নাহর অনুসরণের ভিত্তিতে আমাদেরকে সেই বাস্তবিক ঈমানদারি জীবন যাপন করতে হবে, যার পূর্ণ নমুনা আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিতের রূপে দেখতে পাই।

[১]. মিশকাত শরীফ, হাদীস: ৩০

www.alqurans.com

হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর এক আলোকময় বিজ্ঞতার কাহিনী

এ আলোচনার ধারাবাহিকতায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়া অনর্থক হবে না। হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সামনে জনৈক ব্যক্তির একটি মামলা উত্থাপন করা হলো। তিনি আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট থেকে উক্ত মামলার ব্যাপারে সাক্ষী তলব করলেন। জনৈক সাহাবী বললেন, এ মামলার পক্ষে আমি সাক্ষ্য দিতে পারব। তিনি পুণরায় এই বলে সাক্ষ্য তলব করলেন যে, 'এই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য' বলে কেউ কি সাক্ষ্য দিতে পারবে? অন্য এক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন, যাহাঁপনা আমি তাঁর সম্পর্কে জানি। তিনি বিস্তারিত জানতে চাইলে সাহাবী বললেন, তিনি (প্রথম সাহাবী) পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে উপস্থিত হন; নামায-রোযা ক্বাযা করেন না। এ কারণে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এ কথা শুনে হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তার কাছে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি কখনো তার পাশে থাকার সুযোগ হয়েছিল? তার সাথে কি তোমার কখনো দুনিয়াবী কোন কার্যক্রম হয়েছিল? অথবা, তার সাথে কোন সফর করার সুযোগ কি তোমার কখনো হয়েছিল? তিনি (দ্বিতীয় সাহাবী) প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তুমি তার জীবনের শুধু একটি দিক দেখেছ। যে দিকটি কেবল তার মসজিদে গিয়ে নামায পড়া এবং রোযা রাখা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তুমি তার মসজিদের বাইরের অবশিষ্ট জীবন সম্পর্কে কিছুই জান না; সে কি বাস্তবেও মুসলমান, নাকি নয়। এ ঘটনা থেকে এ কথা পরিস্ফুটিত হল যে, মুসলমানের পরিচয় কেবল নামায-রোযা এবং প্রকাশ্য ইবাদতের মাধ্যমে ফুঁটে উঠে না, বরং তার পুরো সামাজিক জীবনের মাধ্যমে ফুঁটে উঠে। যেখানে তার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ব্যবসায়িক অংশীদারগণ এবং সফর সঙ্গীদের সাথে তার ব্যবহার, আচরণ এবং কার্যকলাপ সবকিছু অন্তর্ভূক্ত।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

"যে ব্যক্তির মুখ এবং হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদে থাকতে পারে, সে ব্যক্তিই মুসলমান।"[১]

যদি কেউ মুসলমানিত্বের এ মাপকাঠির আদলে নিজিকে পুরোপুরিভাবে মানিয়ে নিতে না পারে, তবে জেনে রাখা উচিত, সে একজন নামধারী মুসলমান। ঈমান এখনো তার শিরা-উপশিরায় সংক্রমণ করেনি। এ সব আলোচনার সারকথা হলো, সকল

[১]. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

দুনিয়াবী কার্যকলাপ দ্বীনের সাথে এত গভীর সম্পর্কিত যে, এ দু'টিকে একক না ভেবে দ্বৈত বা আলাদা কল্পনা করলে দ্বীনের ভিত্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে দ্বীনের নয়টি অংশ দুনিয়াবী জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এক অংশ ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি কতই না অবিচার যে, আমরা দস্তরমত দ্বীনের নয় অংশকে উপেক্ষা করে কেবল এক অংশের দিকে মনোনিবেশ করে চলেছি। এভাবে আমাদের যাহির মুসলমান এবং বাতিন ঈমানের নূর শূন্য হয়ে আছে।

আমরা যদি সীরাতের গ্রন্থ সমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন চরিত মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করতে পারব যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনের বিভিন্ন দিককে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে। মসজিদে অতিক্রান্ত মুহূর্তগুলো হুকুকুল্লাহর বিশ্লেষণে ইবাদতের দিক, আবার মসজিদের বাইরে অতিক্রান্ত মুহূর্তগুলোতে উম্মতের বাস্তবিক জীবন যাপনের শিক্ষা নিহিত। যুদ্ধ ক্ষেত্র, ব্যবসায়িক লেনদেন, সাধারণ মানুষের সাথে আদান-প্রদানের ব্যাপার, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে একান্ত মিলন মেলায় ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শিক জীবনে উম্মতের জন্য শিক্ষার উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও শত্রুদের সাথে লিয়াজোঁ প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা তিনি উম্মতকে দিয়ে গেছেন। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের ভিতরের জীবন কিংবা মসজিদের বাইরের জীবনের কোন দিক এবং মুহূর্ত এমন নেই, যেখানে উম্মতের জন্য কোন না কোন শিক্ষা নিহিত নেই।

পবিত্র কোরআন এক জায়গায় আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছে ঃ

يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾

"তাঁরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যাঁরা ভূমিতে আস্তে আস্তে হাঁটে। যখন অজ্ঞরা তাঁদের সাথে কথা বলে, তখন তাঁরা বলেন, তোমরা শান্তিতে থাক। আর তাঁরাও আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যাঁরা তাঁদের প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেন।"[১]

[১]. সূরা ফোরকান ২৫:৬৩-৬৪

www.alqurans.com

অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, যাঁরা ধীরে ধীরে ভূমির উপর পা ফেলেন, যাতে করে কিছুর উপর সীমালঙ্ঘন না হয়ে যায়। আর যদি কেউ তাঁদের সাথে সীমালঙ্ঘন করে বসে, তাঁরা কেবল তাদের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। উপরন্তু তাদের জন্য শান্তি কামনা করে সামনে অগ্রসর হয়ে যান। উপর্যুক্ত আয়াতটিতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি হলো, আমলী স্তর। প্রথমটি হলো, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কোন আমল অন্য লোকদের জন্য কষ্টের কারণ হবে না। দ্বিতীয়টি হলো, অত্যাচারীদেরকে তাঁরা শুধু ক্ষমা করে দেন তা নয়, বরং তাদের শান্তি কামনা করে দু'হাত তুলে দোয়াও করেন।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, তাঁরা সিজদারত অবস্থায় এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য দু'টি হক্কুল ইবাদের সাথে সম্পর্কিত, এবং শেষোক্ত বৈশিষ্টটি হক্কুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হুকুকুল ইবাদ (বান্দার হক) এবং হুকুকুল্লাহর (আল্লাহর হক) সমষ্টিকে দ্বীন বলা হয়। এদের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করার দ্বারা ধর্মের শান্তি এবং নিরাপত্তা হুমকির মুখে পতিত হয়।

উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হাসিলের উপায়ের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত কোনটিই প্রকৃত উদ্দেশ্যমূলক আমল নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্যমূলক আমল হলো, যেটি স্বয়ং উদ্দেশ্য হবে, কিন্তু আরেকটি উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় বা কারণ হবে না। যেমন- পিপাসা লেগেছে, তাই পানি পান করলাম। এখানে পানি পান করাটা উদ্দেশ্য নয়। বরং এর আসল উদ্দেশ্য হলো, পিপাসা নিবারণ করা। একই ভাবে, ক্ষুধা পেয়েছে, তাই খাদ্য গ্রহণ করলাম। এখানে খাদ্য মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হলো, খাদ্য দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করা। এই দৃষ্টান্তের (Anology) ভিত্তিতে নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ আদায় করা আসল উদ্দেশ্য নয়। অশ্লীলতা এবং অপকর্ম থেকে বাঁচার জন্য নামায, তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়-ভীতি সৃষ্টি করার জন্য রোযা, ধন-সম্পদের পবিত্রতা এবং সমাজকে দারিদ্র মুক্ত করার জন্য যাকাত এবং অনাদায়কৃত ইবাদতের ক্ষতিপূরণ ও অতীত জীবনের গুনাহ্ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ আদায় করা হয়। যাই হোক, ইবাদতের কোন আমল প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়; বরং মহান আল্লাহ্ দেখতে চান যে, তাঁর ইবাদতকারী এবং তাঁর নিকট দোয়া প্রার্থনা কারী ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে তার বান্দাদের সাথে কেমন সম্পর্ক গড়ে তুলছে। সে ব্যক্তি যদি নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার চালায়, ধোঁকা এবং প্রতারণায় তাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে, তাহলে সে কোন মুখে আল্লাহর দরবারে এসে বলছে যে, হে আমার প্রভু! আমি আপনার বান্দা; আপনার ইবাদতের জন্য উপস্থিত হয়েছি! মহান আল্লাহ্ এ ধরণের বান্দাদেরকে বলেন, হে মুনাফিক! তুই মিথ্যুক। তুই নিজের ইবাদতের

www.alqurans.com

মাধ্যমে আমাকে প্রতারণায় ফেলতি পারবি না। তুঁই যদি আমার সত্যিকার বান্দা হতি, তাহলে আমার বান্দাদেরকে ভালোবাসতি; এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতি। যে আমার বান্দাদের উপর দয়াশীল নয়, সে আমার করুণা লাভের উপযুক্ত নয়।

হাদীসে কুদ্‌সী

এখানে আমি একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে কুদ্‌সী উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এক ব্যক্তিকে ডেকে বলবেন, হে মানুষ! দুনিয়াতে আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সেবার জন্য এগিয়ে আসনি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, এবং তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করার জন্য পানি দাওনি। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, এবং তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাওয়ার জন্য কিছুই দাওনি। লোকটি বলবে, হে রব! এটি কি করে সম্ভব? আপনি তো এ বিশ্বজগতের প্রভু। আপনি এ সকল ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। মহান আল্লাহ্ উত্তরে বলবেন, হে পাপী! তোমার শহর-এলাকায় অমুক ব্যক্তি অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তাকে সেবা করার জন্য এগিয়ে আসনি। আমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, যদি তুমি সেখানে যেতে, তাহলে আমাকে তার সাথে দেখতে পেতে। একই ভাবে, অমুক পিপাসার্ত ব্যক্তি আমার নামে তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, আর তুমি তাকে পানি দিতে অস্বীকার করেছিলে। তুমি যদি তাকে পানি দিতে, তাহলে আমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, তুমি আমাকে সেই পিপাসার্ত ব্যক্তির সাথে দেখতে পেতে। আর সেই পানিটি আমি তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতাম। এভাবে, অমুক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আমার নামে তোমার নিকট খাদ্য চেয়েছিল, তুমি যদি তাকে খাওয়াতে, তুমি আমাকে তার পাশে দেখতে, এ খাদ্যটি খোদ আমিই পেতাম।[১]

মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে এ কথা বিশ্বাস করাতে চান যে, যদি তোমরা তাঁর দয়া ও করুণা পেতে চাও, তবে তাঁর বান্দাদের উপর এহসান কর। তবে তোমরা তাঁর দান এবং সম্মানের ভাগী হতে পারবে। জেনে রেখো, ধর্মের

---

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ: قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي.... ....فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

মুসলিম শরীফ, بَاب فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ ২:৩১৮

ব্যাপারে কুফরিকে পশ্রয় দেয়া এবং মুনাফেকি কার্যকলাপ গ্রহণ করা, আল্লাহর ক্রোধ এবং রাগ ডেকে আনে। মুনাফেকি এবং চাটুকারিতার জীবন পরিহার করে নিজের সকল কার্যকলাপকে সামগ্রিকভাবে ধর্মের অধীনে করে নেয়াই হলো 'আইনে ঈমান' বা 'প্রকৃত ঈমান'।

পূর্বে ঈমানের যে প্রথম আদব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে, তার দাবি হলো, জীবনকে একটি পুরো একক হিসেবে মেনে নিয়ে তার প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখাকে ইসলামি শরীয়তের গন্ডির ভিতর প্রবেশ করাতে হবে। এভাবে দ্বিতীয় আদবের আলোচনায় যাহেরী এবং বাতেনী জীবনকে ইসলাম এবং শরীয়তে মুহাম্মদীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়া হয়েছে। অন্য ভাবে বলতে গেলে ইসলাম এবং শরীয়তের সাথে জীবনকে এমন ভাবে সম্পর্ক গড়ে দিতে হবে, যাতে করে জীবনের কোন একটি অংশেও কোন তারতম্য অবশিষ্ট না থাকে। যাহির এবং বাতিন যেন পরস্পরের প্রতিচ্ছবি বনে যায়। তৃতীয় আদব হলো, হক-বাতিল, কুফর-ঈমান এবং ভালো-মন্দের ব্যাপারে শাশ্বত-মজবুত মাপকাঠি, সুন্নত এবং সীরাতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণাঙ্গ রূপে মেনে নেয়া। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং জীবন চরিতে যা কিছু পরিলক্ষিত হবে, তা প্রশ্নাতীত ভাবে মেনে নিতে হবে। এর বিপরীতে বুদ্ধি-বিবেচনার সকল সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেশকৃত সিদ্ধান্তের সামনে বিসর্জন দিতে হবে।

عقل قرباں کن بہ پیش مصطفیٰ

বিসর্জন দিয়ে দাও বুদ্ধিকে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের সামনে।

এখন আমি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আদবের উপর আলোচনা আরম্ভ করব। তবে দ্বিতীয় আদব সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কেননা, এটির সাথে প্রথম আদবের সাথে অনেকটা মিল রয়েছে। আর প্রথম আদব তো যথেষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। তবে তৃতীয় আদবকে খানিকটা বিস্তারিত পরিসরে আলোচনা করা হবে, যাতে করে সেটির পরিপূর্ণ ভাব উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

সকল অশ্লীলতা ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ ঈমানের পরিপন্থী

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿٣٣﴾

www.alquransms.com

"(হে নবী) আপনি বলে দিন, আমার প্রভু প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সব ধরণের বেহায়াপনাকে হারাম করে দিয়েছেন।"[১]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, হে আমার প্রিয় নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তামাম বেহায়াপনা, অশ্লীল কথাবার্তা এবং যে সকল অশ্লীল কার্যকলাপ শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয, সবগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন। সেগুলো কোন ভাবেই জায়েয হতে পারে না। তাই অসৎ চরিত্র এবং বেহায়াপনার উপর ভিত্তিশীল কোন কথা এবং কাজ এ ধরণের নেই যে, যেটিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় এবং জায়েয করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত আয়াতে اَلْفَوَاحِشُ 'আল ফাওয়াহিশ' শব্দের শুরুতে 'الف ، لام' ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী যখন বহুবচন শব্দের শুরুতে 'الف ، لام' আসে, তখন তার মধ্যে ব্যাপকতার অর্থ বিদ্যমান থাকে। যার ফলশ্রুতিতে শব্দটির ভাব এবং অর্থে এমন ব্যাপকতা এসে যায়, তার শ্রেণীর কোন এককও তখন বাইরে থাকে না। এ কারণে গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে, কোন বিষয় লজ্জা, চরিত্র এবং শরীয়তের নিয়ম-নীতি বিরোধীও হবে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে সেটি পছন্দনীয় এবং জায়েযও হবে, এটি হতে পারে না; বরং অসম্ভব। উপরন্তু এ নিষেধাজ্ঞার বিধানটিকে মহান আল্লাহ্ এতটা ব্যাপক করে দিয়েছেন যে, কেবল দৃশ্যমান বস্তুই হারাম নয়, যেমন- মিথ্যা, চুরি এবং অগনিত অপকর্ম, যেগুলোকে প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কবান ব্যক্তি মন্দ এবং অপছন্দনীয় মনে করে এবং সেগুলোকে ঘৃণা করে। এটিকে পবিত্র কোরআন "মা যাহারা মিনহা" বাক্যাংশ দ্বারা বর্ণনা করেছে। কিন্তু এমন কিছু বস্তু ও কার্যকলাপ রয়েছে, যেগুলোকে প্রকাশ্যে ভালো মনে করা হয়, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তা মন্দ এবং অপছন্দনীয়, সেগুলোকে পবিত্র কোরআন "মা বাতানা" বলে চিহ্নিত করছে। এগুলো এমন কিছু অদৃশ্যমান সূক্ষ্ম রহস্য, যেখানে দুনিয়াবি নিয়ম-কানুন হোঁচট খেতে পারে; কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক গঠিত নিয়ম-কানুন এতটা পরিপূর্ণ এবং হেকমতপূর্ণ যে, তা হোঁচট খাওয়া অসম্ভব। যাহির এবং বাতিন উভয়ের ক্ষেত্রে এর দৃষ্টিভঙ্গি এক সমান। কোন কোণ বা দিক এর আওতার বাইরে নেই।

য়াহির-বাতিনের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বিধান জারি করেন, সে বিধানটি মানব জীবনের জাহেরি এবং বাতেনি অবস্থাকে অন্ত

[১]. সূরা আ'রাফ ৭:৩৩

র্ভূক্ত করে। কেননা, যিনি শরীয়তের বিধানাবলীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি জীবনের যাহির-বাতিন উভয়েরও সৃষ্টিকর্তা। কোন দিক তাঁর নজরদারীর বাইরে নেই। কোন একটি আদেশ যখন জীবনে বাস্তবায়িত হয়, তখন যাহির-বাতিনের মত-পার্থক্য রহিত হয়ে যায়। প্রকাশ্যে যদি মানুষের রূপ থেকে খোদাভীতি, পরহেযগারী এবং তাকওয়া চকচক করে, কিন্তু অভ্যন্তরের চেহারাটির দিকে তাকালে সেখানে জমাটবদ্ধ অপবিত্রতা, আবর্জনা ও দুর্গন্ধের কারণে কেউ তার কাছে যেতে না পারে, তাহলে ইসলামী শরীয়ত এ ধরণের খোদাভীতিকে কখনো সমর্থন করতে পারে না। দিনের আলোকরশ্মী ও রাতের আঁধারীতে রূপের হরেক রকম পরিবর্তন চোখে পড়লে, কবি ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ভাষায় জীবন,

چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر

"চকচকে রূপ বাইরে তার।
ভিতরেতে ছেয়ে গেছে,
জমকালো অন্ধকার।"

এ চরণের একটি নমুনা বনে যাবে।

যাহির-বাতিনের মধ্যে এ তারতম্য মানব জীবনকে উলট-পালট, ভারসাম্যহীন করে দেয়। উচ্চ মানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। আর কর্মজীবনে নেমে আসে ভয়াবহ অবনতি।

এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা যে, বর্তমান যুগে মানবতার অধপতনের সবচেয়ে বড় কারণ হলো, মুসলমানদের জীবনে যাহির-বাতিনের অমিল। সেই নামধারী জাতীয় নেতৃবৃন্দ, হাজারো জনতার সামনে মঞ্চ কাঁপানো বক্তব্য দিয়ে, ক্ষমতার মসনদ থেকে ফরমান জারি করে এবং উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ক্ষান্ত হন না, আবার এদিকে শ্রোতামন্ডলীও তাঁদের জ্ঞানপটুতা ও শান-শওকতে অবাক হয়ে যান। কিন্তু যদি তাঁদের জীবনকে খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে এ সত্যবাদিতা ও নিঃস্বার্থতার প্রচারকারী এবং বড় গলায় হকের দাবিদারদেরকে মিথ্যাবাদী, মুনাফিক এবং প্রতারক ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। এ দ্বিমুখী নীতি পূর্বোক্ত আয়াতে করীমাতে বর্ণিত কোরআনী বিধানকে অমান্য করার কুফল।

কোরআন-সুন্নাহ্ চারিত্রিক এবং ধর্মীয় আইনের উৎস

ইসলামের শরয়ী বিধান মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন উভয়কে পরিশুদ্ধ করার জন্য দায়বদ্ধ। ইসলামে নৈতিক গুণাবলী ও দ্বীনকে একই মাপকাঠির আওতাধীন রাখা হয়েছে। এটিই ইসলামের মহত্বের প্রমাণ। অপর পক্ষে, পাশ্চাত্য নীতিতে চরিত্র, লজ্জা এবং ধর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। এ

www.alqurans.com

বলতে পারতেন, এত বিলম্ব করার কি প্রয়োজন ছিল। উত্তরে বুযর্গ বললেন, গতকাল আমি নিজেই গুড় খেয়েছিলাম। এতে গতকাল আমার কথার প্রভাব পড়ত না। গতকাল আমি বাসায় গিয়ে জীবনে আর গুড়-মিঠা খাবো না বলে শপথ করেছি। তাই আমি মনে করছি যে, আজ আমি শিশুটিকে উপদেশ দেয়ার উপযুক্ত হয়েছি।

উপদেশ গ্রহণ মূলক দ্বিতীয় কাহিনীটি ইমাম আযম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে। একদা তিনি এক গলিতে ছেলেদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি বাচ্চাদের কাছে পৌঁছলে এক শিশু উচ্চস্বরে তার সাথীদেরকে বলল, এখন খেলা বন্ধ করো। দেখছো না, তোমাদের পাশ দিয়ে আল্লাহর এক অলী অতিক্রম করছেন!! যিনি সারা রাত ইবাদত করেন, এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ঘুমান না। এ কথা শুনে তাঁর শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি বুকের কাপড় মুঠিয়ে ধরে বলতে লাগলেন, নোমান বিন ছাবেত! দেখছ, মানুষ তোমার সম্পর্কে কী ধারণা করে বসেছে!! এরপর তিনি শপথ করলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বছর এশার ওযু দিয়ে ফযরের নামায আদায় করলেন। রাতে এক মুহূর্তের জন্যও তিনি পিঠ বিছানার সাথে লাগান নি। এ কারণে, আজ তের শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও মানুষের অন্তর ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলাইহির প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে। ফিকাহ ও ইসলামী আইনের প্রতিটি মাস্‌আলার সমাধানের জন্য মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয়।

এ ধরণের পরিবর্তন এবং বিপ্লবী অধ্যায় এমনিতেই রচিত হয় না। যাহির-বাতিন, কথা-কাজ, উঠা-বসা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন থেকে অসামঞ্জস্যতা ও দূরত্ব দূর করতে হবে। কোন চেষ্টাই বৃথা যায় না।

তাবলীগি তৎপরতা ফলপ্রসু নয় কেন?

দুর্ভাগ্য বশতঃ আজ আমাদের দেশে দ্বীন প্রচারণার এ রীতির প্রচলন শুরু হয়ে গেছে যে, যখন আমাদের চারপাশে তাবলীগ, দ্বীনের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হচ্ছে না; দ্বীনের অবস্থা পূর্বের ন্যায় থেকে যাচ্ছে, এখন আমরা একথা বলে দায়মুক্তি পেতে চাচ্ছি যে, আমাদের কাজ তো হলো তাবলীগ করা; অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো, ফলাফল পয়দা করা আল্লাহর কাজ। আমরা তো আখিরাতে ফলাফল এবং ছাওয়াব পেয়ে যাব। এভাবেই আমরা আমাদের অযথা কাজের উপর পর্দা ফেলার প্রয়াস পাচ্ছি। কথা আর কাজের অমিলকে আখিরাতের বদলা ও ছাওয়াবের চাদর দ্বারা ঢেকে দিচ্ছি। যদি তাবলীগী তৎপরতা বর্তমান পৃথিবীতে ফলাফল বের করে আনতে সক্ষম না হয়; জীবনকে বিপ্লবী রূপ দিতে না পারে, তবে আমরা নিজেদের মুখে খোদায়ী বিধানকে ভঙ্গ করে শয়তানী বিধানকে বিজয়ী করার অঙ্গীকার করেছি (নাউযুবিল্লাহ্)। এ বাস্তবতা নতুন প্রজন্মকে কীভাবে ইসলামের দিকে উৎসাহিত করতে পারে, যেখানে দ্বীনের ফলাফলকে আখিরাতের বদলা এবং ফলাফল বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে? এ চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি দ্বীন এবং দুনিয়ার মাঝে

পৃথকীকরণ ও কর্তন সৃষ্টি করার সমতূল্য। এ ধরণের ধারণা চৈন্তিক ভীতি, বেআমলী ও দ্বীনের হাকীকতকে উপেক্ষা করার অভিনয় করা এবং তাকদীরের পর্দায় অবস্থার উন্নতি সাধন থেকে বিমুখ হওয়ার দলীল। আল্লামা ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ঃ

کسے خبر کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی
عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ

বলেছে কে, করে প্রতারণা
সে খোদার সাথে,
আপনে করেছে প্রতারণা
আপনের সাথে।
আপনেতে নেই আমল
বে আমল মুসলমান,
তাকদীরের দোহাই দিয়েছে
সে তাকদীরের বাহানা।

মুমিনের ইহকালীন সফলতার খোদায়ী জিম্মাদারি

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন ঃ

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

"তোমরা মনোবলহারা হয়ো না, চিন্তিত হয়োনা। তোমরা যদি প্রকৃত পক্ষে মুমিন হও, তবে তোমরাই সফলকাম, তোমরাই বিজয়ী।"[১]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে মনোবলহারা এবং চিন্তিত না হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। সাথে সাথে জীবনের চেষ্টা-প্রয়াসে সাহায্য-বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ঈমানের মৌলিক শর্ত, অর্থাৎ, ঈমানের আদবগুলোকে যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে। এ পার্থিব জীবনে সফলতার জামানতটি ঈমানের দাবিগুলোকে পূর্ণ করার সাথে শর্তযুক্ত। এ কারণে ভীরুতা, হকের সাথে বাতিল, ভালোর সাথে মন্দ এবং সত্যের সাথে মিথ্যাকে সংমিশ্রণ করা; অপকর্মের সাথে সমঝোতা এবং মুনাফেকি জীবন যাপন থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী একটি বিষয়। সাথে সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানাবলীকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করার জন্য মনের

[১]. সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৯

www.alqurans.com

অভিলাষ-কামনাকে সব সময়ের জন্য পরিত্যাগ করতে হবে। কবির ভাষায় আরো পরিত্যাগ করতে হবে ঃ

دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا

দুই রঙ ধারণ করা ছেড়ে দাও,
হয়ে যাও এক রঙের।
হয়তো একেবারে মোম বনে যাও,
নতুবা পাথর।

জীবনকে উপর্যুক্ত চরণের ব্যাখ্যা বানিয়ে নেওয়াই হলো দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা এবং কামিয়াবীর জিম্মাদার।

দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা

"أَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ" এর ভিত্তিতে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হকের কালেমাকে উচ্চাসীন করত: জাহেরী-বাতেনি ভাবে ঈমানকে মেনে নেওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে পার্থিব জীবনের সফলতার সুসংবাদ। অত:পর "وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ" বলে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, তোমাদের প্রচেষ্টাকে কখনো বৃথা যেতে দেয়া হবে না। খোদায়ী নুসরাত সর্বদা তোমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। ঈমানদারগণের সাথে মহান আল্লাহ্ অঙ্গীকার করছেন, হকের পতাকাবাহী এ আলোকময় পথ কেবল আখিরাতের জীবনে নয়, বরং এ পার্থিব জীবনেও বিজয়ী হয়ে থাকবে। এ কারণেই তো দিন-রাত " رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " এ ভাবে দোয়া করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ দোয়াটির মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, একমাত্র ইসলামই এমন একটি ধর্ম, যা মানুষকে আখিরাত সাজানোর পূর্বে দুনিয়া সাজানোর আহ্বান জানায়। কিন্তু এর পূর্বশর্ত হলো, মুমিনের শিরা-উপশিরায় ঈমান এমন ভাবে সংক্রমিত হতে হবে যে, জীবন থেকে লৌকিকতা, স্ববিরোধিতা এবং মুনাফেকী চিরতরে দূর হয়ে যেতে হবে। এটি ছিল ঈমানের দ্বিতীয় আদব। এবার আমি তৃতীয় শিষ্টাচারের দিকে উপনীত হতে যাচ্ছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে এর দাবিটি হলো, আমলের মাপকাঠি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনাদর্শ, এটির উপর ভিত্তি করে মুমিনের প্রত্যেক আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা হয়।

শর্তহীন ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণই মুক্তির পথ

তৃতীয় আদব সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿٦٥﴾

"হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার রবের শপথ, এরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্বাচন না করে।"[১]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁর শপথের মাধ্যমে বাক্য শুরু করেছেন। সেই বিশ্বজগতের মালিক আপন মাহবুবকে সম্বোধন করে নিজের শপথ নিচ্ছেন, সাথে সাথে শপথটিও তাঁর কর্তৃত্বের, যা প্রত্যেক কামাল এবং কুদরতকে অন্তর্ভূক্ত করে। শব্দটির মধ্যে এমন সৌন্দর্য্য ঝলমল করছে যে, শব্দটি দেখলেই তাঁর সত্ত্বার কথা স্মরণ পড়ে। আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, তিনিই শাহী সৃষ্টিকর্তা; সৌন্দর্য্য, চিত্তাকর্ষক মনোরম সৃষ্টির (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূর্ত প্রতীক। যিনি সকল বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতার আঁধার। তাঁর মতো রূপ এবং সীরাতের অধিকারী না পূর্বে ছিল, না কখনো পয়দা হবে। অনন্তকাল ধরে তাঁর অনুরূপ কেহ নেই। তিনিই (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসমান-জমিন সৃষ্টির মূল কারণ। তাঁর সম্পর্কে কবি ইকবাল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কতই না সুন্দর বলেছেন ঃ

خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے

نبض ہستی پتش آمادہ اسی نام سے ہے

তাঁরি নামে গড়া এ
তাঁবু নীল আকাশের।
তাঁরি নামে হয় উষ্ণ
শিরা জগতের।

আয়াতের পরবর্তী অংশে উল্লেখিত ঘোষণার উপর কোন ধরণের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ না থাকার জন্য মহান আল্লাহ্ শপথ নিচ্ছেন। অর্থাৎ, হে প্রিয় নবী, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! যারা সকল ব্যাপারে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেবে না, তারা মুমিন হতেই পারবে না।

উপর্যুক্ত আয়াতে, কে মুমিন এবং কে মুমিন নয়, এ কথার ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। "فَلَا وَرَبِّكَ" এর মধ্যে "فَ" বর্ণটি "গুরুত্ব (তাকীদ) বাচক বর্ণ", এবং "لَا" "না বাচক বর্ণ"। এটি বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে কয়েকটি গুরুত্ব

[১]. সূরা নিসা ৪:৬৫

বাচকের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। এ আয়াতে বর্ণনা শৈলীর বিবেচনায় চারটি পর্যায়ে এ ব্যাপারে "তাকীদ" বা "গুরুত্ব" দেওয়া হয়েছে যে, লোকগুলো নিজেদের জান-মাল, এক কথায় জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে আপনাকে বিচারক মনে না করলে কখনো ঈমানদার হতে পারবে না। অর্থাৎ, হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সকল বিবাদ, ঝগড়া ও সকল সমস্যার সমাধান আপনার কাছে। আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। তবে, প্রকাশ্যে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বাতেনিভাবে সেটিকে অস্বীকার করলে তাও নির্দেশ অমান্য করার শামিল। যেমনটি পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"। অতপর "ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا" বলে সব সময়ের জন্য এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আপনার নির্দেশকে জাহেরি এবং বাতেনি ভাবে খুশী মনে গ্রহণ করে না নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমানের দাবি মিথ্যা, অপরিপূর্ণ। রাসূলের পরিপূর্ণ এবং শর্তহীন আনুগত্য ব্যতীত কামেল ঈমানের কল্পনাই করা যায় না।

কোরআনি আদেশের মৌলিক প্রেক্ষাপট

পবিত্র কোরআন কোন ধরণের সঙ্কীর্ণতা ও মলিনতা ব্যতিরেকে আপন খুশি-সন্তুষ্টির সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে একটি মৌলিক সমস্যার সমাধান পেশ করেছে। তা হলো, নির্দেশের বাস্তবায়ন এমনভাবে হতে হবে যে, অন্তরে কোন বোঝা-মহার্ঘতা এবং মস্তিষ্কে কোন ধরণের যন্ত্রণা থাকতে পারবে না। এর উদাহরণ অনেকটা এরকমই, এক ছেলে দুধ খেতে চাচ্ছে না, বাবা বলছে দুধ পান কর। তার দুধ পান করার ইচ্ছা না থাকলেও বাবার শাস্তির ভয়ে সে দুধ পান করছে। যদিও আদেশ পালন করার জন্য তার মন চাচ্ছে না, কিন্তু চাপে পড়ে নির্দেশ মানতে বাধ্য হচ্ছে।

এমনই একটি উদাহরণ সেই ছাত্র সম্পর্কে দেয়া যেতে পারে, যাকে তার শিক্ষক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, খবরদার! অমুক স্থানে যেতে পারবে না। ছাত্রের প্রবল আকাঙ্খা থাকলেও শিক্ষকের ভয়ে সে যেতে সাহস করছে না। এ নির্দেশ পালন করা কিন্তু মনে-প্রাণে নয়, বরং শিক্ষকের জোর প্রয়োগের কারণে।

মহান আল্লাহ্ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার নির্দেশ এভাবে দিচ্ছেন যে, কেবল মৌখিক ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে ক্ষান্ত হওয়া যাবে না, বরং তাঁর আনুগত্যে অন্তরের সন্তুষ্টি ও আগ্রহ মুখের চেয়ে বেশী থাকতে হবে; নির্দেশ পালনে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর অংশ গ্রহণ থাকতে হবে, অন্তরে এর স্বাদ টগবগিয়ে উঠতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ ধরণের গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে তাঁর মুহাব্বত এবং ইশকের মর্যাদায় উপনীত হওয়া যায়। যাহির-বাতিনের সকল

www.alqurans.com

অমিল নিঃশেষ হয়ে ভিতরে-বাইরের অবস্থা এক হয়ে যায়। কেউ যদি রাতে ইবাদত করার জন্য জাগ্রত হয়, তবে সেটি মানুষ তাকে আবেদ-যাহেদ মনে করার জন্য নয়, বরং সেটি হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য। এ খোদাভীতি এবং ইবাদত নির্ভেজাল ভাবে আল্লাহর জন্য হলে সেটি আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হয়। তবে এটি মনে রাখতে হবে যে, রাসূলের আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর নৈকট্যের স্তরে পৌঁছা সম্ভব নয়। কবি ইকবালের ভাষায় ঃ

بمصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر با ونہ رسیدی تمام بولہبی ست

নিজকে রাসূলের আনুগত্যে সঁপে দাও
এটাই পরিপূর্ণ ধর্ম
অন্যথায় সেটা হবে আবু লাহাবের কর্ম

অন্তর এবং নিয়তের অবস্থা ভালই আল্লাহ্ জানেন

লৌকিকতার সিজদা এবং লোক দেখানো আমল আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য। যে সিজদা এবং ইবাদতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়াও অন্য কোন উদ্দেশ্য জড়িত থাকে, সেই ধরণের সিজদা এবং ইবাদত তাঁর কাছে কখনো প্রয়োজন নেই। কবি ইকবাল এ কথাটিকে কবিতার মাধ্যমে কত চমৎকার ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন ঃ

جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو ہے صنم آشناں تجھے کیا ملے گا نماز میں

যখন আমি সিজদায় পড়ি
জমিন হতে ডাক আসে
তোমার অন্তর মূর্তি খানায়
নামাযে তুমি কি পাবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

«إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ».

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তোমাদের রূপ এবং ধন-সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি লক্ষ্য করেন তোমাদের অন্তর এবং নিয়্যতের দিকে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মর্মার্থ হলো, আল্লাহর "বাসীর" এবং "আলীম" এর সত্ত্বা তোমাদের রূপ, গঠন এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না, বরং সর্বাবস্থায় তাঁর দৃষ্টি থাকে তোমাদের অন্তর এবং অন্তরের ভিতর গুপ্ত

[১]. মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ২:২৮৫, ৫৩৯

www.alqurans.com

থাকা নিয়্যতের দিকে। তাঁর দরবারে সেই আমলগুলোই গ্রহণযোগ্যতা পায়, যা নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এ ছাড়া যে আমলগুলো তাঁর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আর এ কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি দু'টি আলাদা আলাদা বিষয় নয়, বরং উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

শেষ কথা

ঈমানের তৃতীয় আদবের সারাংশ দাঁড়ালো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের বেষ্টনীতে প্রবেশের পর পুরো জীবন দুনিয়া-আখিরাতের সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। তাঁর কোন নির্দেশের যেন অমান্যতা না হয়। তাঁর আনুগত্যের হক এমন অকৃত্রিমভাবে আদায় করতে হবে, যেন এর চেয়ে উত্তম কোন পন্থা অবশিষ্ট না থাকে। তাঁকে এমন ভাবে ভালোবাসতে হবে, যেন এর চেয়ে বেশী ভালোবাসা কল্পনা করা যায় না।

ঈমানদারগণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নাও।"[১]

অর্থাৎ, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা আপনার নির্দেশের সামনে যেন এভাবে মাথা নত করে, যাতে করে নির্দেশ পালনের হক্ব আদায় হয়ে যায়। আরবী ভাষার একটি নিয়ম হলো, যখন কোন 'ফেয়েল' এর সাথে তার 'মাসদার' কে 'হাল' হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন সেটি দু'টি অর্থ প্রদান করে। একটি হলো, সেই ক্রিয়াটি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়নের দাবি রাখে ; অর্থাৎ, সেই কাজটিকে এমন গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে করে সেটি শতভাগ বাস্তবায়নের মুখ দেখে। দ্বিতীয় অর্থটি হলো, সেই কাজটিকে এমন গুরুত্বের চোখে দেখতে হবে, যাতে করে কাজটির যোগ্যমতো হক আদায় হয়ে যায়, অর্থাৎ, কাজটি যেভাবে হওয়া উচিত ঠিক সেভাবেই সম্পন্ন হয়ে যায়।

যেমন- পবিত্র কোরআনের এক স্থানে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

[১]. সূরা নিসা ৪:৬৫

"মহান আল্লাহ্ হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে বিশেষ ভাবে কথা বলেছেন।"[১]

এখানে 'كَلَّمَ' ক্রিয়া এবং 'تَكْلِيمًا' মাসদার ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এর অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ্ হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর (মুসা আলাইহিস সালাম) মর্যাদা অনুযায়ী কথা বলেছেন।

ঈমানদারগণের প্রতি সম্বোধন করে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ কর। এবং (বড় সম্মান ও ভালোবাসার সাথে) সালাম পেশ করো।"[২]

এখানে ঈমানদারগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণের সুন্নতের উপর আমল করতে তোমরাও আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়, সালাম পেশ কর। এমন সালাম পেশ কর, এর চেয়ে উত্তম সালাম যেন কল্পনা করা না যায়। এর অর্থ হলো, সেই সালামটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান এবং মর্যাদার উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ, আমার মাহবুবকে সর্বোত্তম সম্মান প্রদর্শন কর। তাঁর নিকট এমন সালাম পাঠাও, যেমনটি ইতিপূর্বে কেউ প্রেরণ করেনি। "وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" বলে ইরশাদ করেছেন, কেবল দরূদ-সালামের উপরই যথেষ্ট করবে না, বরং আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়ে থাকবে। এমন ভাবে তাঁর নির্দেশ পালন কর, যেন এর চেয়ে উত্তম ভাবে নির্দেশ মানার অবকাশ না থাকে। অতঃপর কোন প্রত্যক্ষদর্শী যেন অনিচ্ছাকৃত ভাবে চিৎকার করে বলে ওঠে যে, ইতিপূর্বে এর চেয়ে উত্তম কোন নির্দেশ চোখে পড়েনি। না কোন নির্দেশদাতা চোখে পড়েছে; না কোন নির্দেশ মান্যকারী চোখে পড়েছে। অর্থাৎ, নির্দেশটিও সর্বোত্তম, নির্দেশদাতা পরিপূর্ণতার সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন এবং নির্দেশমান্যকারীরাও পরিপূর্ণতার সর্বোত্তম পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।

[১]. সূরা নিসা ৪:১৬৪
[২]. সূরা আহযাব ৩৩:৫৬

www.alqurans.com

চতুর্থ অধ্যায়

ঈমান ও অবিচলতা

মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর জীবন পথের বিভিন্ন পরীক্ষার মুখে জীবনকে এমন অবিচলতার সাথে পার করতে হবে, যেন দৃঢ়তার পায়ে সামান্য পরিমাণও পদস্খলন না ঘটে। ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় 'ইসতিকামত' বা 'অবিচলতা'। এ আলোচনায় আমি 'ইসতিকামত' এর মর্মার্থকে কোরআন-হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

"নিশ্চয়ই যাঁরা বলেছেন 'আমাদের প্রভু মহান আল্লাহ্', এবং তাঁরা এ কথার উপর অবিচল রইল, তাঁদের উপর ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হয়ে বলেন, তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা। তোমাদেরকে যে জান্নাত দেওয়ার ওয়াদা ছিল, সেটি পাবার সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। আমরা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে তোমাদের বন্ধু। তোমাদের মন যা চাইবে তার সবই জান্নাতে রয়েছে; চাইবে মাত্রই তা তোমরা পেয়ে যাবে। এটি মহান ক্ষমাশীল, দয়ালুর (আল্লাহর) পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি মেজবানী।"[১]

উপর্যুক্ত আয়াত তিনটিতে মহান আল্লাহ্ তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

সর্ব প্রথম আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জানার বিষয় হলো, এখানে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থই বা কি ? অত:পর ঈমানের সাথে অবিচলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহকে রব

[১]. সূরা হা-মীম সিজদা ৪১:৩০-৩২

হিসেবে যারা মেনে নিবে, তাদের সাথে অবিচলতার কি সম্পর্ক রয়েছে ? অতপর 'অবিচলতা' তথা আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসের সুবাদে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদেরকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়, এ ধরণের অসীম অনুগ্রহ ও উপঢৌকনের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার দাবি

উপর্যুক্ত পবিত্র আয়াতটির শব্দগুলোর প্রতি গভীরভাবে তাকালে দেখা যায়, সেখানে মহান আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টির মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে। এর অর্থ হলো, আল্লাহকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার করে নেয়া এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে সেটির দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর বাস্তব কার্যকলাপের মাধ্যমেও তাঁর প্রভুত্বের উপর অটল থাকার প্রমাণ দিতে হবে। মহান আল্লাহকে প্রভু হিসেবে মেনে নেয়ার তিনটি ব্যাখ্যা বয়েছে। সূরা 'আস্‌র' -এ একথার উল্লেখ রয়েছে।

"إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ"[১] অর্থাৎ, কালের শপথ। যেটি মানুষের সকল কর্মকান্ডের সাক্ষী হয়ে আছে। মানুষ যতই আত্নগোপন করার চেষ্টা করুক না কেন, কালের অক্ষি থেকে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারে না। সে অতন্দ্র প্রহরী কালের শপথ নিয়ে মহান আল্লাহ্ বলছেন, মানুষ তার কৃতকর্ম, অদূরদর্শিতা ও অবিচক্ষণতার কারণে ক্ষতি এবং অনিষ্টের পথে ধাবিত হচ্ছে। "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا"সেই লোকগুলো বাদে, যাঁরা মুখে ঈমানের স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন, অন্তরে সেটির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। "وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" উপরন্তু, মুখে স্বীকার এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করাকে যথেষ্ট মনে করেননি, বরং মহান আল্লাহর বিধানাবলীর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমানের আমলী স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন এবং আমলী জীবনে অপকর্ম পরিহার করে নেক আমল করেছেন। অর্থাৎ, উত্তম আমল, পরহেযগারী এবং খোদাভীতিকে নিজের জীবনের নিদর্শন বানিয়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করে চলেছেন। "وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ" এরপর, আমলে সালেহের মধ্যেই যথেষ্ট থাকেননি, বরং হকের পতাকাতলে অবিচল থেকে সামাজিক ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। যখনই হক-বাতিলের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দিয়েছে, সর্বদা হককে প্রাধান্য দিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পারিবারিক ব্যাপারে, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ইত্যাদি সকল পার্থিব কর্মকান্ডে আল্লাহর বিধান মেনে চলেছেন। হাসি-কান্না, সচ্ছলতা-দরিদ্রতা, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবন,

[১]. সূরা আসর ১০৩:১-২

অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনে হকের যে মাপকাঠি তাঁরা নির্ধারণ করেছেন, সর্বদা সেটির সত্য-মিথ্যা যাচাই করা এই নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা কখনো এ নির্দেশ অমান্য করেননি। কারবার-ব্যবসায় অতি লভ্যাংশ অর্জন করার চেয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। লেনদেনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি বিবেচনা করতেন। অপরের সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি নির্ধারণে তাঁদের জীবন "اَلْحُبُّ لله وَالْبُغْضُ لله" (আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং শত্রুতাও তাঁর খাতিরে) এর বাস্তব নমুনা হয়ে আছে। "وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ" সেই সৎকর্মের অধিকারী ব্যক্তিগণ হকের উপর অটল থাকার কারণে তাঁরা বিভিন্ন বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ধৈর্যের সাথে তা মুকাবিলা করতেন। হায়-হুতাশ করতেন না; বরং সবর ও সহনশীলতার মাধ্যমে প্রতিটি কঠিন ও সংকটাপন্ন ব্যাপারগুলোকে মেনে নিতেন। তাঁদের দৃঢ়পদ কখনো প্রকম্পিত হত না।

চৈন্তিক মুহূর্ত

আল্লাহর সেই সালেহ বান্দাদের সাথে যদি আমরা আমাদেরকে এক মুহূর্তের জন্য তুলনা করি, তবে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বাস্তবতাকে বুঝতে পারব। আমরা সামান্যতম পার্থিব লালসার তাড়নায় আল্লাহর বিধানাবলীকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলি। স্ত্রী-সন্তানদের সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করতে থাকি। মনের প্রবৃত্তি এবং পার্থিব স্বার্থকে নিজের মাবুদ, আর অর্থ-সম্পদকে প্রয়োজন মেটানোর বাস্তব উপকরণ মনে করে বসে আছি। কোন বিষয়ে আল্লাহর কথা মেনে চললেও অন্য আরেকটি ব্যাপারে গেলে সেখানে খোদায়ী বিধান মানতে পারি না, নিজের মন মতো চলি। যেন আমরা বিরুদ্ধবাদীদের, আল্লাহর বিধান অমান্যকারীদের জীবন বিধানকে ঈমান মনে করছি। বক্রতা ও খোদা বিমুখিতাকে বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্বের পথ মনে করি। অথচ আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁরাই আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, যাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল আমলে সালেহের উপর কায়েম থাকেন না, বরং তাঁদের বাস্তব আমলগুলো প্রমাণ করে যে, তাঁরা হকের পক্ষে, বাতিল বিরোধী। তাঁরা হক্বের পথে সম্মুখিত বিপদ-শংকা গুলোকে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করেন।

বিপদে কৃতকার্যতা

পবিত্র কোরআনের বাণী অনুযায়ী আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ পৃথিবীতে সকল বিপদাপদ ও পরীক্ষা থেকে অবিচলতার সাথে পরিত্রাণ পান, কৃতকার্য হন। কেউ হকের পথে পা রাখলে, তাকে পদে পদে বিভিন্ন বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সে অবিচলতার মানদন্ডে কৃতকার্য হয়েছে কি হয়নি, তা যাচাই করার জন্য

www.alqurans.com

এমনটি করা হয়। তাকে পরীক্ষা করা হয় বিভিন্ন ভাবে; কখনো অঢেল ধন-সম্পদের মালিক বানিয়ে, কখনো বা দৌলত-নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে, অর্থ-সম্পদ থেকে বঞ্চিত রেখে। "ثُمَّ اسْتَقَامُوْا" -এ আয়াতাংশে সেই পরীক্ষার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ পরীক্ষায় বিজয়ী ব্যক্তিগণ মহান আল্লাহর নিকট পুরস্কার এবং সম্মানের অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হন।

অবিচলতা যাচাইয়ের পাঁচটি মূলনীতি

"সূরা আসর" এ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেগুলো খানিকটা বিস্তরিতভাবে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে পার্থক্য করার জন্য মহান আল্লাহ্ কিছু মূলনীতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এগুলো নিম্নোক্ত আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ
وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

"আমি তোমদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা এবং তোমাদের জান-মাল ও ফল-শস্য পতন ও স্বল্পতা ইত্যাদির যে কোন একটির মাধ্যমে তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব। (হে নবী!) আপনি ধৈর্য ধারণকারীদেরকে সুসংবাদ দিন।"[১]

ইরশাদ হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঈমানের দাবি যদি সঠিক হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমদেরকে পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করব। বিভিন্ন ধরণের বিপদ-পরীক্ষার মাধ্যমে তোমাদেরকে যাচাই করা হবে। যদি তোমরা নিজেদের ঈমানে অবিচল থেকে পরীক্ষায় পরিপূর্ণ ভাবে উত্তীর্ণ হতে পার, তবে তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হিসেবে বিবেচিত হবে, একজন কৃতকার্য ঈমানদার হিসেবে পরিগণিত হবে।

গভীর ভাবে তাকালে, ঈমান এবং পরীক্ষা উভয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কেউ ঈমানে প্রবেশ করল, আর তার ঈমানের দাবিকে বিপদ-পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হবে না, এমন হতেই পারে না। উপর্যুক্ত আয়াতে পাঁচ প্রকারের পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানের অবিচলতা নিরীক্ষা করার জন্য এগুলোকে পাঁচটি মূলনীতি বলা যেতে পারে।

[১]. সূরা বাকারা ২:১৫৫

এক. ভয়-ভীতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা

অর্থাৎ, ভয়ের মৌল বুনিয়াদ, যেটি জীবনের সাথে প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে। ভয়-ভীতির বিভিন্ন রূপ এবং ধরণ রয়েছে। কখনো মৃত্যুর ভয়। অর্থাৎ, সর্বদা মরে যাওয়ার আশংকা জিঁইয়ে থাকা। কখনো ধন-সম্পদ ছিনতাই হয়ে যাওয়ার ভয়। কখনো ছেলে-সন্তান অবাধ্য হয়ে যাওয়ার ভয়। কিংবা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা। ইজ্জত-সম্মান কীভাবে সংরক্ষিত থাকবে। কোন অপরিচিত জায়গা, দূর-দূরান্তে নিরাপত্তাহীনতার (INSECURITY) ভয়। রাতদিন ভয়ে অন্তর কাতর হয়ে আছে। আল্লাহ্ দেখতে চান যে, এ চরম ভয়-ভীতি ও অবিরাম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্কটা কেমন, এ চরম মুহূর্তেও তোমরা আল্লাহকে কতটুকু মান্য করছ। প্রতিটি মুহূর্তে যদি এভাবে আল্লাহর সাথে তোমাদের সম্পর্ক স্থায়ী থাকে, তবে তোমরা এ পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হতে পেরেছ।

দুই. ক্ষুধার মাধ্যমে পরীক্ষা করা

অর্থাৎ, ক্ষুধা-দরিদ্রতার মাধ্যমে তোমাদেরকে নিরীক্ষা করা হবে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিরামহীন মেহনতের পরও তোমরা অভাব-অনটনের জীবন যাপনে বাধ্য হবে। এটি এ কারণে নয় যে, মহান আল্লাহ্ তোমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত নন, কিংবা তোমাদের সাথে তাঁর শত্রুতা আছে (নাউযুবিল্লাহ্)। বরং, এটির একমাত্র কারণ হলো তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখা যে, এ দুর্যোগময় মুহূর্তেও তোমরা আল্লাহর সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রেখেছ।

তিন. ধন-সম্পদ হ্রাসের মাধ্যমে পরীক্ষা করা

অর্থাৎ, পরীক্ষামূলকভাবে তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও বস্তুবাদী আয়েশ-নেয়ামতে ভরপুর করে দিয়ে পরবর্তীতে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। এটির উদ্দেশ্য হলো, পরীক্ষা করে দেখা যে, ধনাঢ্য এবং দারিদ্র উভয় অবস্থায় তোমাদের ঈমান কোন ধরণের রূপ পরিগ্রহ করে। ধন-সম্পদ খুইয়ে যাবার পর তোমরা খোদার প্রভুত্বকে অস্বীকার করে গাইরুল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছ কিনা, এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ কিনা, তা তিনি পরীক্ষা করে দেখেন।

চার. জান ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করা

কখনো কখনো প্রাণ ধ্বংস বা মৃত্যু ঘটানোর মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। মৃত্যু সামনে দেখে তোমরা কি জীবনের আশা করছ, নাকি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য মুখিয়ে আছ। এভাবে মৃত্যুর সময়ও তোমাদেরকে নিরীক্ষা করা হয়।

www.alqurans.com

পাঁচ. ফল-ফলাদিতে ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা

সর্বশেষ পরীক্ষা এই যে, কখনো কখনো তোমদেরকে সন্তান-সন্ততি দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। কখনো ছেলে-সন্তান দান করে পুণরায় তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। কখনো পুত্র সন্তান না দিয়ে কেবল মেয়ে সন্তান দান করেন। আবার কখনো কেবল পুত্র সন্তান দিয়ে মেয়ে সন্তান থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।

পুরো জীবনই পরীক্ষা

প্রত্যেক আদম সন্তানকে এ ধরণের বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়। গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত পাঁচ প্রকারের পরীক্ষা গুলোর অসংখ রূপ হতে পারে। কেবল ভয়ের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, এর কোটি কোটি প্রকার হতে পারে। দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান শক্তির ভয় মানুষের শিরা-উপশিরায় বিম্বিত থাকে। একই ভাবে ক্ষুধা, দারিদ্র, জান-মালের ক্ষয় এবং সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে অগণিত কুমন্ত্রণা, ভয়, দ্বিধা, শঙ্কা এবং দুশ্চিন্তা সর্বদা লেগেই থাকে। সারকথা হলো, পুরো জীবন একটি নিরীক্ষা। এ পরীক্ষায় সকলকে অংশ নিতে হয়। এ অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা থেকে কেউ পালিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু এ পরীক্ষার স্তর পার করার পরই ঈমানের প্রকৃত কারুকার্য-রহস্য প্রকাশ পায়, এবং তা খাঁটি সোনার ন্যায় ঝলমল করতে থাকে।

ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যম পন্থাই সঠিক পথ

মানুষের জীবন মানেই হাসি-খুশি, দুঃখ-মুসিবত, সচ্ছলতা-দরিদ্রতা, প্রশান্তি-আরাম, রাগ-চিন্তা ইত্যাদির সমষ্টির নাম। মানুষ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্বদা ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যম পন্থায় জীবন যাপন করা জরুরী। হাসি-খুশি, রাগ-দুঃখ কোন সময় যেন আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ভয় থেকে বিমুখ না হয়ে যায়। হযরত যুফার রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ চিত্রটিকে কতই না চমৎকার ভাষায় তুলে ধরেছেন ঃ

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم وذکاء

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

"সে ব্যক্তিকে যুফার মানুষ মনে করে না,
সে যতই প্রতিভাবান হোক না কেন।
যে আরাম-আয়েশে আল্লাহকে স্মরণ করে না,
না ক্রোধের সময়।"

www.alquransms.com

ঈমানের মাপকাঠি

আল্লাহর বন্দেগী এবং আনুগত্যের মাপকাঠি জ্ঞান-বুদ্ধি নয়, বরং মানুষ তাদের পরিবর্তনশীল জীবনের বিভিন্ন অবস্থায়, পর্যায়ে খোদার কত নিকটবর্তী বা দূরবর্তী হয়েছে এর উপরই ঈমানের ভিত্তি। হাসি-খুশি ও দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তগুলোতে তারা আপন প্রভুকে স্মরণ করছে, নাকি ভুলে গেছে। সচ্ছলতা ও সংকটাপন্ন মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, নাকি আমোদ-ফুর্তির তালে তালে আত্মহারা হয়ে গেছে ; অথবা, কান্না-আহাজারিতে লিপ্ত রয়েছে।

ঈমানকে পরীক্ষা করার জন্য যিকির, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এ তিনটি মাপকাঠি রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে কোন মানুষের ঈমানদার হওয়ার বিষয়টি যাচাই করা হয়। পবিত্র কোরআন এ মাপকাঠি তিনটিকে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছে ঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো (আমার যিকর করো)। তবে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করেবো। তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার ব্যাপারে কুফরী করো না (আমার নাশুকরী করো না)।"[১]

এ পবিত্র আয়াতটি আল্লাহ্ এবং বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তবে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। কথাটির আরো একটি অর্থ হতে পারে। তা হলো, "তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাক, আমি পার্থিব জীবনে তোমাদেরকে স্বরণ করবো। অর্থাৎ, আমার স্মরণের মাধ্যমে তোমাদের মান-সম্মান বেড়ে যাবে, তোমাদরকে প্রসিদ্ধির উচ্চাসনে সমাসীন করা হবে। অতপর বলছেন ঃ তোমরা সর্বদা আমার কৃতজ্ঞতা পালন করতে থাক এবং আমার প্রদত্ত নেয়ামতের নাশুকরী করো না।

সচ্ছলতা-দরিদ্রতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর যিকিরের নির্দেশ

মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সামর্থ-যোগ্যতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন। তিনি তাঁর হেকমত মোতাবেক বান্দাদেরকে নেয়ামত দানও করেন। আবার নেয়ামত থেকে বঞ্চিতও রাখেন। কিন্তু এতে তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসে না। বান্দা তার প্রভুর প্রদত্ত নেয়ামতে ভরপুর হোক কিংবা না হোক, সর্বদা প্রভুর সাথে তার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ কারণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা তার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে।

[১]. সূরা বাকারা ২:১৫২

সুলতান মাহমুদ গযনবী রাহমতুল্লাহি আলাইহির দাস আয়ায সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিদিন সে আন্ডার গ্রাউন্ডের একটি কক্ষে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকত। দরবারের জনৈক ব্যক্তি আয়াযের এ কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপনীয় ভাবে খবর নিয়ে সুলতান মাহমুদ গযনবী রাহমতুল্লাহি আলাইহির কানে দিল যে, সে প্রতি রাতে অনেক্ষণ পর্যন্ত কক্ষ বন্ধ করে বসে থাকে। আমাদের মনে হচ্ছে, সে রাজকীয় ভান্ডার থেকে ধন-সম্পদ চুরি করছে। রাতে একাকী অবস্থায় সে তা চুপে চুপে গুনে। প্রতিদিনের মতো এক রাতে যখন সে নিজের কক্ষে অবস্থান করছিল, মাহমুদ গযনবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি সেখানে পৌঁছে দরজায় নক করলেন। দরজা খুলে এত রাতে সেখানে সুলতান মাহমুদ রাহমতুল্লাহি আলাইহিকে দেখে আয়ায হতভম্ব হয়ে গেল। কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে মাহমুদ রাহমতুল্লাহি আলাইহি ইয়্যাযের সামনে একটি পুরনো ভাঙ্গা সিন্দুক, খোলা-পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আয়ায! এই সিন্দুকে কি রয়েছে? ইয়ায বলল, যখন রহস্য ফাঁস হয়েই গেল, তাহলে শুনুন, আমি এখানে আপনার কোন ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখিনি। অতঃপর ভিতর থেকে সে একটি ছেঁড়া টুপি, একটি ছেঁড়া জামা এবং একটি পুরনো ছেঁড়া লুঙ্গি বের করল। সুলতান মাহমুদ গযনবী রাহমতুল্লাহি আলাইহি এগুলো দেখে বললেন, হে ইয়ায! এ ফাটা-ছেঁড়া পুরনো কাপড় দিয়ে তুমি কি কর? আয়ায বলল, হে সম্রাট! যে কাপড় পরিধান করে সুদর্শন শরীরে আমি প্রথম বার আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, এগুলো সেই কাপড়। সেদিন আপনি আমাকে দাসত্বের মর্যাদায় উপনীত করেছিলেন। আজ আমি বাদশাহর একজন নিকটতম লোক, এবং আমি আজ অনেক নেয়ামতের অধিকারী। কিন্তু আমি আমার সে অবস্থাকে ভুলিনি। আর প্রতি রাত নিজের ছেঁড়া পুরনো কাপড়ের সামনে চোখের জল ফেলে খোদাকে স্মরণ করি, যিনি আমাকে অগণিত নেয়ামতের অধিকারী করেছেন। আয়াযের এ হালত দেখে সুলতান মাহমুদ গযনবী রাহমতুল্লাহি আলাইহির শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। অজান্তে তাঁর চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল। আর বলতে লাগলেন, কী আশ্চর্যের বিষয়! তুমি আজো তোমার সে দিনের কথা ভুলনি, যে দিন তুমি আমার নিকট প্রথম বার এসেছিলে। অথচ আমি! যে উলঙ্গ অবস্থায় আমি আমার মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছি, যে দিন আমার শরীরে কোন কাপড় ছিল না, সেই অবস্থাকে ভুলে গিয়ে আমি আমার প্রভুকে ভুলে গেছি।

সুতরাং নেয়ামত অর্জিত হবার পর সানুষের জন্য আবশ্যক যে, সে যেন নেয়ামত অর্জিত হবার আগের অবস্থাকে সর্বদা স্মরণ করতে থাকে এবং প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতএব, আল্লাহর প্রভুত্বের উপর ঈমান আনার মর্মার্থ এটিই দাঁড়ালো যে, তার কোন মুহূর্ত যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি না যায়।

অবিচলতার ফসল

বান্দা যখন অবিচলতার মর্যাদায় উপনীত হয়, সচ্ছলতা-দরিদ্রতা উভয় অবস্থায় ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও যিকরকে জীবনোপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে, তখন তার উপর আল্লাহর অনুগ্রহরাজি বর্ষিত হতে থাকে। এ বান্দাদেরকে "تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ" এর সুসংবাদ শুনানো হয়। ফেরেশতাদেরকে এই বলে নির্দেশ দেয়া হয়, "হে মহিমান্বিত ফেরেশতগণ! আমার এ কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী বান্দাদের উপর অবতীর্ণ হয়ে যাও। যাঁরা সুখ-দুঃখ, ধন-সম্পদের অপ্রতুলতা ও দারিদ্রতা সকল অবস্থায় আমাকে স্মরণ রেখেছে। আমার স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতার আঁচল নিজের হাত থেকে ছাড়েনি। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাগণ দুনিয়ায় অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে তাঁদের নিরাপত্তার অধীনে নিয়ে আসেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ স্তরে পৌছার কারণে দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল ভয়ভীতি তাঁদের অন্তর থেকে বিদূরিত হয়ে যায়।

তাঁরা "أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" এর জীবন্ত সাক্ষ্য বনে যান। এরপর মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে "لَا تَحْزَنُوْا" বলে সম্বোধন করেন এবং তিনি ফেরেশতাগণের মুখে ঘোষণা করাচ্ছেন ঃ

﴿نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

অর্থাৎ, এখন তোমরা একাকী, বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত নও। বরং দুনিয়া এবং আখিরাতে আমরা তোমাদের সাথী। আমি আমার ফেরেশতাগণকে তোমাদের সঙ্গী করে দিয়েছি। তারা তোমাদের সেবক, রক্ষণাবেক্ষণ কারী। তোমাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এখন দুনিয়া এবং আখিরাতের সব নেয়ামতরাজি তোমাদের জন্য। এখন তোমাদের জন্য "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ" এর মুহূর্ত চলে এসেছে। তোমাদের সব আশা এবার পূরণ করা হবে। "وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ" এর মর্যাদা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এখন তোমরা স্বয়ং তোমাদের জন্য এবং অন্যদের জন্য যা কিছু চাইবে, তোমাদেরকে তা প্রত্যাশানুযায়ী প্রদান করা হবে।

মকবুল বান্দাগণ সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না

পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ করুণা আর অনুগ্রহের উৎস বনে যান। কিন্তু, অনেক সময় তাঁদেরকে বাহ্যিক ভাবে মিসকীন ও অসহায় মনে হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে অনবগত হওয়ার কারণে

www.alqurans.com

তাঁদেরকে তুচ্ছ মনে করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর এমন মকবুল বান্দাগণ সম্পর্কে বলেন ঃ

«رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ».

"তাঁদের চুলগুলো কত এলোমেলো, মানুষের দরজায় তাঁরা ধিক্কার প্রাপ্ত। যদি তাঁরা কোন বিষয়ে আল্লাহর শপথ গ্রহণ করেন, তবে মহান আল্লাহ্ তাঁদের শপথ অবশ্যই পুরো করে দেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যদি এ লোকগুলো তোমাদের দরজার সামনে উপস্থিত হন, তখন তাঁদের পুরনো, ফাটা-ছেঁড়া কাপড় তথা বাহ্যিক অবস্থা দেখে তোমরা তাঁদেরকে তাচ্ছিল্যের কারণে নিজেদের দরজার সামনে থেকে ধিক্কার দিতে দিতে তাড়িয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহর নিকট তাঁদের মর্যাদা এতই উঁচু যে, যদি তাঁরা মুখ ফুটে কোন শব্দ উচ্চারণ করে বসে শপথ করে নেন, তখন তাঁরা খোদার প্রভুত্বকে এমন ভাবে চর্চা করতে থাকেন যে, যাতে করে মহান আল্লাহ্ তাঁদের শপথ বাস্তবে পরিণত করে দেখান; তাঁদের বলা সব কথা সঠিক প্রমাণ করেন। কবি ইকবাল আল্লাহর এ সকল বান্দা সম্পর্কে কতই না সুন্দর বলেছেন ঃ

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ انکو
ید بیضاء لے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں

"এ সূফী সাধকগণের বিশ্বাস কি, জিজ্ঞেস করো না।
তোমরা দেখ তাঁদেরকে।
আপন আস্তিনের ভিতর আলোকিত হাত
নিয়ে বসে আছেন তাঁরা।"

পবিত্র কোরআনের এক স্থানে মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দা সম্পর্কে ইরশাদ করছেন ঃ

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

"এই ধৈর্য ধারণকারীগণকে সুসংবাদ দিন। বিপদে পড়লে যাঁরা বলেন, আমরা কেবল আল্লাহর জন্য এবং আমরা অবশ্যই তাঁর নিকট ফিরে যাব।"[১]

---

১. মুসলিম শরীফ ২:৬০

www.alquransms.com

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন যে, হে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে সব বান্দাদেরকে আপনি সুসংবাদ দিয়ে দিন, তাঁদের উপর কোন বিপদ আসলে তাঁরা কোন ধরণের আহাজারি করেন না এবং কোন অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না; বরং সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তাঁরা বলেন, নিশ্চয়ই আমরা মহান আল্লাহর জন্য। আমাদেরকে আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। দুঃখ-কষ্টের সময় তাঁরা আল্লাহর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করেন না, বরং নিজেদের অবস্থার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত: তাঁর স্মরণে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেন। পবিত্র কোরআনের অন্য একটি জায়গায় মহান আল্লাহ্ তাঁর সেই প্রিয় বান্দাগণের কথা এভাবেই বলেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"এঁরাই (সেই খোশ নসীব) বান্দা, যাঁদের উপর তাঁদের রবের বিভিন্ন প্রকারের করুণা আর রহমত। এঁরা সঠিক পথে অটল রয়েছেন।"[২]

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন, হে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যে সকল বান্দাগণ প্রতিটি মুহূর্তে অবিচলতার সাথে আমার স্মরণের মাধ্যমে নিজেদের অন্তরকে আবাদ করে রেখেছেন, তাঁদের জন্য সুসংবাদ। আমার বিশেষ রহমত তাঁদেরকে ঘিরে আছে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে কত বড় সম্মান আর মর্যাদা দান করেছেন!! তাঁদেরকে এত বড় মর্যাদা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের গলায় দরূদের মালা পরিধান করানো হচ্ছে। এক বিশেষ দরূদ শরীফ তো হলো, যেটি আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ পৃথিবীর গৌরব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পাঠান। হকের পথে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকেও দরূদ এবং অত্যধিক রাহমতের দ্বারা সম্মানিত করা হচ্ছে। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কতে বড় পুরস্কার, তা মানুষের কল্পনার বাইরে!!

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের উপর স্বীয় রহমত এবং বরকত কীভাবে বর্ষণ করেন, তার একটি দৃষ্টান্ত একটি ঘটনার মাধ্যমে পেশ করা হচ্ছে। যেটিকে ঈমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত গ্রন্থ *শারহুস সুদূর* এ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

---

১. সূরা বাকারা ২:১৫৫, ১৫৬
২. সূরা বাকারা ২:১৫৭

"সিরিয়াতে তিন পরহেজগার যুবক ছিল, যারা পরস্পর ভাই। যাদের খোদাভীতি এবং পরহেজগারির বিষয়টি লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল। এক সময় মুসলমান-খ্রীষ্টান যুদ্ধ চলছিল। তাদের অন্তরে জিহাদের স্পৃহা জেগে উঠল। তিন জনই ইসলামী দলে যোগ দিল। রোমের সীমান্তে একটি সংঘর্ষ লেগে গেল, যেখানে খ্রীষ্টানদের একটি বড় বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। রাতে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলে এ তিন যুবক জান হাতে নিয়ে শত্রুদের কাতারে ঢুকে পাগল পারা হয়ে জিহাদে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এ তিন যুবক, যাঁরা মূলত: আল্লাহর রাস্তায় আত্মোৎসর্গের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়েছিল, দুশমনদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গেল। খ্রীষ্টানরা তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে তাদের সম্রাটের নিকট নিয়ে গেল। সম্রাট বলল, এরা যদি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রীষ্টান ধর্মে প্রবেশ করে, তবেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অন্যথায় তাদেরকে সিদ্ধ তেলের কড়াইতে নিক্ষেপ করা হবে। তাঁরা উত্তরে বলতে লাগল, হে অকর্মা! আমরা তো আল্লাহর রাস্তায় জান বিকিয়ে দেয়ার নিয়তেই বের হয়েছি, এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। আমরা এক মুহূর্তের জন্যও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না। তুমি আমাদেরকে কখনো মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। কেননা, শাহাদতের মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর নিকট পৌঁছার অত্যন্ত নিখুঁত একটি মাধ্যম। সম্রাটের নির্দেশে বড় ভাইকে জ্বলন্ত আগুনের উপর উত্তপ্ত তেলের কড়াইতে ফেলে দেয়া হলো। নওজোয়ান "ইয়া মুহাম্মদ" বলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিলেন। মৃত্যুকোলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আপন দুই ভাইকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, দেখ তোমাদের পদক্ষেপে যেন স্থবিরতা না আসে। আমি কড়াইতে পড়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঠিকানায় পৌঁছে যাব, যিনি "হাওযে কাওছার" এর পাড়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমাদের এবং আমার মাঝে কিছুক্ষণের ব্যবধান রয়েছে আমি জান্নাতের দরজায় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় ভাইকেও তেলে নিক্ষেপ করা হলো। তৃতীয় জনকে বলা হলো, দেখ, যদি তুমি আমাদের কথা না মান, তবে তোমার জন্যও এ দশা অপেক্ষা করছে। এখনো সময় আছে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করে নাও। সে বলতে লাগল, অত্যাচারীরা! তোমরা কথা বাড়িয়ে খামাখা কালক্ষেপণ করছ। আমাকেও তোমাদের ইচ্ছে মতো মৃত্যুর পথে নিয়ে যাও। ধর্ম পরিবর্তন করার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। সর্বোপরি তাঁকেও উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি চলছিল। ইতিমধ্যে সম্রাটের উযির আবেদন করল যে, এ খুব সুন্দর এক নওজোয়ান। আমাকে চল্লিশ দিন সময় দিন, এ সময়ে আমি তাকে খ্রীষ্টান বানিয়ে নিতে পারব। সম্রাট যুবককে তার নিকট হস্তান্তর করে বললঃ যদি তুমি এ কাজটিতে সফলতা লাভ করতে পার, তবে আমি তোমাকে উযিরে আযম বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করার অঙ্গীকার করছি। উযির যুবকটিকে সাথে

www.alqurans.com

নিয়ে তার প্রাসাদে চলে গেল। রাতে তার রূপসী কন্যাকে ডেকে বলল, বেটি! এই মুসলমান নওজোয়ানকে খ্রীষ্টান বানানোর মিশন তোমার ঘাড়ে অর্পিত করছি। শুধুমাত্র চল্লিশ দিনে এই কাজটি সম্পাদন করতে হবে। এই যুবতীর নিকট তার এ তাকওয়া বিধ্বংসী রূপ-সৌন্দর্য বড় অহঙ্কারের বিষয় ছিল। তাই সে বাবাকে বললঃ বাবা! এই সময়টি তো অনেক লম্বা মনে হচ্ছে। আর কাজটিও বিশাল নয়। আমি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাকে কাবু করে ফেলব। রূপসী মেয়েটি নজর কাড়া পোশাকের আচ্ছাদনে, সাজ-সজ্জায় নিজেকে এক দারুণ রূপবতী উপস্থাপন করতঃ যুবকের কক্ষে প্রবেশ করল। দেখল, যুবকটি সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর কাছে আহাজারি করছেন। মেয়েটি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; কিন্তু তিনি চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন না। এভাবেই সারা রাত কেটে গেল, কিন্তু মেয়েটি সিজদা থেকে যুবকের মাথা উঠাতে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয় রাতে আবার গেলে মেয়েটি তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখল, চোখে অশ্রু ঝরছে। সারা রাত মেয়েটি তাঁকে নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইল, কিন্তু একবারও তাঁর দৃষ্টি মেয়েটির দিকে গেল না। তৃতীয় দিন মেয়েটি সন্ধ্যার সময়ই তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে গেল এবং যুবককে নামাযরত অবস্থায় দেখতে না পেয়ে খুশি হয়ে গেল। কিন্তু, মেয়েটিকে দেখা মাত্রই যুবকটি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সারা রাত নামাযে কাটিয়ে দিলেন। এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। সময় আরো বাড়িয়ে দেয়া হলো। কিন্তু, আশি রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও সেই নওজোয়ানের আহাজারি এবং আল্লাহর যিকিরে কোন কমতি আসেনি। আল্লাহর সেই প্রেম ও নৈকট্যের কাছে সকল অস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্য এবং প্রতারণা বিফল হয়ে গেল, পরাজিত হলো। অবশেষে যখন রূপসী মেয়েটি যুবককে নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না, স্বয়ং শিকারী শিকারে পরিণত হলো, পরাজয় মেনে নিয়ে অজান্তে সে নিজেই যুবকের পায়ে পড়ল আর বলতে লাগল, যে রবের প্রেমে তুমি সারারাত কান্নাকাটি করছ, সেই রবের কাছে আমাকেও কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে দাও। যুবক তার দিকে না দেখেই তাকে কালেমা পড়িয়ে দিল। মুসলমান হওয়ার পর কুমারীটি বললঃ চল, আল্লাহর দুশমনদের নিকট থেকে পরিত্রাণ পেতে কোন রাস্তা বের করি। মন্ত্রী কন্যা তার দাসকে বলে দু'টি ঘোড়া আনাল। রাতের অন্ধকারে সেই দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর আরোহণ করে মহল থেকে বের হয়ে গেল এবং রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পার হবার জন্য একটি জঙ্গলের দিকে ছুটল। সামনে যুবক এবং তাঁর পেছনে নওমুসলিম কুমারী খ্রীষ্টানদের আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অশ্বের সর্বোচ্চ তেজস্মিকতায় দৌড়াতে দৌড়াতে তারা পাহাড়ের একটি উপত্যকায় পৌঁছে গেল। অকস্মাৎ তাদের কানে ঘোড় দৌড়ের শব্দ আসতে লাগল। শাহজাদীর অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। সে ঘোড়া থামিয়ে ভীতি সঞ্চারিত অবস্থায় বলতে লাগলঃ যুবক! মনে হচ্ছে, তারা

আমাদের পলায়নের বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। সম্রাটের ফোর্স আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য চলে এসেছে। যুবক বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, মহান আল্লাহর অঙ্গীকার আছে যে, তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাদেরকে নিজেই নিরাপত্তা দান করেন। ইতিমধ্যে অশ্বারোহীরা নিকটে পৌঁছে গেছে। যুবক তলোয়ার উঁচু করে বললেনঃ এরা যদি কোন পথিক হয়, তবে তাদের সাথে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। তবে, কোন দুশমন হলে তার মস্তক এই তলোয়ার দ্বারা দ্বিখন্ডিত করে দেয়া হবে। তারা অতি নিকটে পৌঁছে গেলে বুঝা গেল যে, তারা সাদা পোষাক ধারী বাহিনী তাদের সামনে মুখোশধারী দু'জন অশ্বারোহী ছিল। মুখোশ খোলার পর দেখা গেল তারা যুবকের শহীদ হওয়া ভাই। তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে ভাইকে জড়িয়ে ধরলো। যুবক জিজ্ঞেস করলেনঃ ভাই জান! আপনারা দু'জনই তো আমার সামনে শহীদ হয়েছিলেন, এখন এখানে কীভাবে আসলেন? তাঁরা বললেন, আমরা উভয়ই জান্নাতের দরজার সামনে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আমার প্রিয় যুবকেরা! আজ তোমাদের ভাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাফেরদের দল থেকে বের হয়ে আসছে। তোমরা উভয়ই ফেরেশতা এবং শহীদগণের রূহের শোভাযাত্রার অগ্রভাগে গিয়ে তোমাদের ভাইদেরকে অভ্যর্থনা জানাও এবং উভয়ের মধ্যে বিয়ে করিয়ে দাও। তাঁদেরকে আমার গোলামীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। আমরা সকলেই এ উদ্দেশ্যে এখানে তোমাদের নিকট এসেছি।

সারকথা

এ ঘটনা থেকে এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, যাঁরা শত মুসিবত ও বিপদ সঙ্কুল মুহূর্তেও ঈমানের উপর অবিচল থাকে, দুনিয়া এবং আখিরাতের সব নেয়ামত তাঁদেরকে ঢেলে দেয়া হয়। এমনিভাবে তাঁরা এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, তাঁদের মুখ নিসৃত কথাগুলো আল্লাহর তাকদীর বনে যায়। তাঁদের দোয়া কবুল হয়। তাঁদের অস্তিত্ব দুনিয়া এবং আখিরাতে নিজের এবং অন্যদের জন্য আল্লাহর রহমতের খনি হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁদের অস্তিত্ব যেন কবি ইকবাল রহমতুল্লাহি আলাইহির নিম্নোক্ত পঙ্কক্তির আমলী ব্যাখ্যা ঃ

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا
نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں

"তাঁর বাহুর শক্তির কথা
কেউ কি ধারণা করতে পারে?
মুমিনের দৃষ্টির প্রেক্ষিতে
বদলে যায় তাকদীর।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলাম ও তার প্রকৃতি

সূচনা

কয়েকটি বিষয়কে মুখে স্বীকার এবং অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত যেভাবে ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, তেমনিভাবে ইসলামও কয়েকটি বিষয়কে কবুল করার পর সেগুলোর উপর আমল করা ছাড়া পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সাধারণ অর্থে যদিও ঈমান এবং ইসলাম উভয়ই পরস্পর সমার্থক শব্দ, কিন্তু স্বীয় বিশেষ অর্থ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বীয় বিশেষ অর্থে মহান আল্লাহ্, তাঁর রাসূলগণ, আসমানী কিতাব সমূহ, ফেরেশতাগণ, কিয়ামত এবং তাকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান। একই ভাবে একত্ববাদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযান শরীফের রোযা রাখা এবং হজ্জ করাকে পারিভাষিকভাবে ইসলাম বলা হয়। উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে ইসলামের রুকন বলে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে মুখে স্বীকার এবং অন্তরে সেগুলোর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় ঈমান, আর এ বিষয় গুলোকে বাস্তবে পরিণত করাকে বলা হয় ইসলাম।

হাদীসে জিবরাঈল

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য বুঝার জন্য হাদীসে জিব্রাইল অধ্যয়ন করা জরুরী। হাদীসে জিব্রাইলের বর্ণনা 'মাশহুর' রিওয়ায়তের একটি হাদীস। এটিকে প্রায় একই ভাষায় সকল মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারী হলেন, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, যাঁকে ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। আবার, লোকটির অবয়ব দেখেও মনে হচ্ছিল না যে, তিনি কোন সফরকারী ব্যক্তি। সাধারণতঃ সফরকারী ব্যক্তির শরীরে সফরের যে ক্লান্তি বা চিহ্ন দেখা যায়, তাও তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। তাঁর চুলগুলো ছিল ঘন কালো। পরিহিত কাপড় ছিল দুধের মতো সাদা। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দো'জানু হয়ে বসে গেলেন, এবং তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রশ্নোত্তর গুলো নিম্নরূপ ঃ

«يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ ، أَنْ تَشْهَدَ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ

www.alqurans.com

وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ ، قَالَ
: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ
بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ،
قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ: أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ :
اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ: قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

জিব্রাইল ঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে 'ইসলাম' সম্পর্কে কিছু বলুন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো, (কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের সমষ্টির নাম) এক. তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। দুই. (আরো সাক্ষ্য দিবে যে,) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তিন. নামায পড়বে। চার. যাকাত দিবে। পাঁচ. রমযানের রোযা রাখবে। ছয়. সামর্থ থাকলে হজ্জ করবে। জিব্রাইল ঃ আপনি সত্য কথাই বলেছেন। ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ঃ আমাদের আশ্চর্য লাগল যে, তিনি প্রশ্ন করে স্বয়ং তিনিই প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয়েছে বলে ঘোষণা দিলেন!! জিব্রাইল ঃ আমাকে 'ঈমান' সম্পর্কে কিছু বলুন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ (ঈমান হলো,) আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর গ্রন্থ সমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের উপর তুমি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে। বিশেষ করে, ভালো-মন্দের তাকদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করবে।জিব্রাইল আলাইহিস সালামঃ আপনি সত্য কথাই বলেছেন।জিব্রাইল আলাইহিস সালামঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে কিছু বলুন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ (ইহসান হলো,) তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবে, যেন তুমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে সক্ষম না হও, (অর্থাৎ, তুমি যদি তাঁকে দেখতে পারার স্তরে গিয়ে পৌছতে না পার,) তবে কমপক্ষে এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তিনি তোমাকে দেখছেন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, প্রশ্নোত্তরের পর লোকটি চলে গেলেন। খানিক পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ওমরকে) বললেন, হে ওমর! তুমি কি জান, প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.alqurans.com

ওয়াসাল্লামই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি হলেন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম । তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি তোমাদের নিকট এসেছিলেন।[১]

এ বর্ণনাটি হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকেও বর্ণিত আছে।

দ্বীনের তিনটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের তিনটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রথম প্রয়োজনীয়তা হলো, ঈমান। যেটির সম্পর্ক মূলত: মানুষের আকীদা এবং মূল্যবোধের সাথে। দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা হলো, ইসলাম। যেটির সম্পর্ক মূলত: মানুষের আমল এবং কার্যকলাপের সাথে। তৃতীয় প্রয়োজনীয়তা হলো, ইহসান। এর অর্থ হলো, মানুষের যাহির-বাতিনের মধ্যে যখন সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তার আকীদা ও আমলের রূহানী প্রভাব তার অন্তরকে আলোকিত করতে থাকে, তখন তার মধ্যে একটি অবস্থা নসীব হয়, যার কারণে তার অন্তর থেকে দুনিয়ার বস্তুবাদী প্রয়োজনের লোভ-লালসা বিদূরিত হয়ে যায় এবং বান্দা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করত: তাঁর বিশেষ নূর এবং অভাবনীয় তজল্লীকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে কিংবা মহান আল্লাহ্ তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তার চিন্তায় খোদা প্রেম ও করুণার এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটান, যেটি তার অন্তরকে দুনিয়াবী সকল কামনা-বাসনার চাহিদা থেকে মুক্ত করে দেয়। এখান থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণ হয় যে, কেবল ইসলামের রুকনগুলোকে আন্তরিক ভাবে পালন করলে কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না, না কেবল আকীদা সংশোধনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি চূড়ান্ত গন্তব্য তথা আল্লাহকে পেতে পারে। যদি ইসলাম এবং ঈমান উভয়ের দাবিকে যথাযথ ভাবে পুরো করা যায়, তখনই মানুষ সঠিক মুসলমান এবং মুমিন বলার অধিকারী হয়। আর যখন ঈমান এবং ইসলামের দাবিগুলোকে পালন করার ক্ষেত্রে এখলাস তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, তখন সে স্তরকে বলা হয় 'ইহসান'।

ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের বিষয়বস্তু

ঈমানের বিষয়বস্তু হলো আকাইদ। আর আকাইদের সাথে সম্পর্কযুক্ত জ্ঞানশাস্ত্রকে পারিভাষিকভাবে 'ইলমুল কালাম' বা 'কালাম শাস্ত্র' বলা হয়। এভাবে ইসলামের বিষয়বস্তু হলো, মুসলমানদের আমল। এর জ্ঞানতত্ত্বকে পারিভাষিকভাবে বলা হয় 'ইলমুল ফিকাহ' বা 'ফিকহ শাস্ত্র'। এভাবে ইহসানের বিষয়বস্তু হলো, ঈমানের বাতেনী তথা রূহানী অবস্থার প্রাপ্তি। এর সংশ্লিষ্ট জ্ঞানতত্ত্বকে বলা হয়, 'ইলমে তরীকত' অথবা 'ইলমে তাসাউফ'। সবগুলো জ্ঞানতত্ত্ব একটি উৎসের সাথে

[১]. বুখারী, ঈমান অধ্যায় ; মুসলিম, ঈমান অধ্যায় ; মিশকাত, ঈমান অধ্যায়, হাদীস : ১, পৃ. ১১

সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর প্রত্যেকটি অন্যটি ব্যতীত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ কারণে, ঈমান ব্যতিরেকে ইসলাম অপরিপূর্ণ। একই ভাবে ইসলাম ছাড়াও ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ সম্ভব নয়। আবার ইহসান ব্যতীত ঈমান এবং ইসলাম উভয়ই অপরিপূর্ণ থেকে যায়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, কোন মানুষ কেবল ইসলামের আক্ষরিক জ্ঞান গুলোকে আয়ত্ব করার মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ মুমিনের স্তরে পৌঁছতে পারে না ; না কেবল বাতেনি এবং রূহানি উপকরণগুলোকে চর্চা করার মাধ্যমে।

প্রকৃত কথা হলো, এক দিকে যেমন ঈমানের দাবিকে উপেক্ষা করা যাবে না, অন্যদিকে ইসলামের মূলনীতির উপর আমল করার মধ্যে কোন ধরণের অলসতা এবং কৃপণতা করা যাবে না। এতে করে ঈমান এবং ইসলাম, উভয় শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রূহানি ধারণার শীর্ষচূড়া, 'ইহসান' নামক স্তরটি অর্জন করতে হবে।

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি এই উভয় তরীকাকে একত্রিত করার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

«مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ».

"যে ব্যক্তি ইলমে ফিকহ্ তথা ইসলামের আক্ষরিক জ্ঞান আয়ত্ত করেছে, কিন্তু রূহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিকতা পরিত্যাগ করেছে, সে সন্দেহাতীত ভাবে ফাসিক। অপর পক্ষে, যে ব্যক্তি রূহানিয়্যাত তথা আধ্যাত্মিকতা তো চর্চা করেছে, তবে 'ফিক্হ্' কে উপেক্ষা করেছে, এমন ব্যক্তিও সন্দেহাতীত ভাবে নাস্তিক। আর যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে, সেই ব্যক্তিই উদ্দেশ্য হাসিল করতে পেরেছে, আল্লাহকে পেয়েছে।"[১]

অর্থাৎ, তার এক হাতে শরীয়তের দীপ্তি থাকবে এবং অন্য হাতে থাকবে শরীয়ত এবং রূহানিয়্যাতের মশাল। (সে যেন প্রকাশ্য শরীয়ত তথা ফিক্হের মাধ্যমে তার বাহ্যিক জগৎকে এবং বাতেনী শরীয়ত তথা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে আপন অন্তর জগৎকে আলোকময় করছে।)

কুয়তুল কুলুব গ্রন্থ প্রণেতা শায়খ আবু তালেব রাহমতুল্লাহি আলাইহি এ ধারণাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

«هُمَا عِلْمَانِ أَصْلِيَانِ لاَ يَسْتَغْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ الآخِرِ بِمَنْزِلَةِ الإِسْلاَمِ وَالإِيْمَانِ مَرْتَبِطٌ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالآخِرِ كَالْجِسْمِ وَالْقَلْبِ لاَ يَنْفَكُّ أَحَدٌ عَنْ صَاحِبِهِ».

[১]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ ১:২৫৬, ইকাযুল হিমাম ফি শরহিল হিকম ১:৫

www.alqurans.com

"শরীয়ত এবং তরীকত, অর্থাৎ, ইলমে ফিক্‌হ্ এবং আধ্যাত্মিকতা, উভয়ই দু'টি মৌলিক জ্ঞানশাস্ত্র। এদের কোনটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না। এদের সম্পর্ক ইসলাম এবং ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্কের ন্যায়। এরা উভয়ই দেহ এবং অন্তরের ন্যায় সম্পর্কযুক্ত। এদের একটি অন্যটি থেকে পৃথক হতে পারে না।"[১]

ঈমান, ইসলাম এবং ইহসান, এ তিনটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রত্যেকটির আমলী সীমারেখার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিছে দেহলভী রাহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইসলামের তিনটি দিক রয়েছেঃ

১. تصحيح العقائد বা আকীদা শুদ্ধিকরণ। এটি উপরে বর্ণিত হাদীসে জিব্রাইলে ঈমানের বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত। উসূল শাস্ত্রের আলেমগণ এ বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা-গবেষণা করেন।

২. تصحيح العمل বা আমলের পরিশুদ্ধতা। এটি উপরে বর্ণিত হাদীসে জিব্রাইলে ইসলামের বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লেখিত। ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের ইমামগণ এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

৩. تصحيح الإخلاص বা ইখলাস পরিশুদ্ধকরণ। এটি উপরে বর্ণিত হাদীসে জিব্রাইলে ইহসানের বিষয়বস্তু রূপে নির্দেশিত। এটিই শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য সমূহের সারমর্ম। শরীয়তের সাথে এর সম্পর্ক হলো, দেহের সাথে আত্মার যে সম্পর্ক, শব্দের সাথে অর্থের যে সম্পর্ক, তার অনুরূপ। সুফীগণ এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন।[২]

ঈমান, ইসলাম এবং ইহসানই ইসলামী শরীয়তের অংশ। ইসলামী জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ ধারণা এ তিনটির সমন্বিত কাঠামোর উপরই নির্ভরশীল। এ পরিসরে আমার উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামের রুকন গুলোকে ব্যাখ্যা করা, এ কারণে এই অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে কেবল 'ইসলাম' শব্দের ভাবার্থ নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

ইসলাম শব্দের মর্মার্থ

শব্দমূল : 'ইসলাম' শব্দটি س, لام, م বা 'سَلَمٌ' শব্দমূল থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো, বেঁচে থাকা, নিরাপদ থাকা, নিরাপত্তা পাওয়া ইত্যাদি। এ আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

১. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ ১:২৫৬
২. তাফহীমাতে ইলাহিয়্যাহ্ ১:৭-৮

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

"যে ব্যক্তির মুখ এবং হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, (অন্যান্য মুসলমানের জান, মাল এবং ইজ্জত-সম্মান নিরাপদ থাকে,) সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান।"[১]

উপর্যুক্ত শব্দমূলের বাবে ইফআল হতে 'ইসলাম' শব্দটি গঠিত হয়েছে। আমার ধারণা মতে 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ চারটি ঃ

এক. ইসলামের প্রথম আভিধানিক অর্থ হলো, স্বয়ং নিরাপত্তা পাওয়া, অন্যদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া এবং কোন বস্তুকে রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ অর্থের ভিত্তিতে ইসলাম শব্দের অর্থ, সকর্মক এবং অকর্মক ক্রিয়া উভয়ই হতে পারে। কেননা, এতে নিজে নিরাপত্তা পাওয়ার অর্থ যেমন অন্তর্ভূক্ত, তেমনিভাবে অন্যকে নিরাপত্তা দেয়ার অর্থও বিদ্যমান। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ ﴿١٦﴾

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এমন ব্যক্তিকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (মুহাম্মদ) মাধ্যমে নিরাপদ রাস্তার সন্ধান দেন।"[২]

দুই. ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ হলো, মেনে নেয়া ; গ্রহণ করে নেয়া ; নত হওয়া ; স্বেচ্ছায় আনুগত্য প্রকাশ করা ইত্যাদি। এ অর্থ হিসেবে ইসলাম শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কোরআন ও হাদীসে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। সূরা বাকারাতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

"তার প্রভু যখন তাকে বললেন ঃ তুমি আনুগত্য প্রকাশ কর। (উত্তরে) সে বললঃ আমি বিশ্বজগতের মালিকের (আল্লাহর) আনুগত্য প্রকাশ করেছি।"[৩]

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴿١٢٥﴾

১. বুখারী ১:৬
২. সূরা মায়িদাহ ৫:১৬
৩. সূরা বাকারা ২:১৩১

www.alquransms.com

"যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর কাছে নত করেছে, সাথে সাথে সে একজন নিঃস্বার্থবাদী আল্লাহ্ওয়ালাও, তার চেয়ে উত্তম ধার্মিক আর কে হতে পারে!"[১]

উপর্যুক্ত ধারণার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইসলাম থেকে উদ্দেশ্য হলো, এমন আনুগত্য, জান চলে গেলেও যেটিকে মুখে বা অন্তরে অস্বীকার করার সাহস পয়দা হয় না। অর্থাৎ, যেখানে আনুগত্য এমন স্তরে গিয়ে উপনীত হবে, যেটি কবি ইকবালের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

بے خاطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشاے لب بام ابھی

নমরুদের আগুনে ইশক,
নির্বিগ্নে ঝাপিয়ে পড়ল।
জ্ঞান অচল হয়ে পড়েছে
প্রাণ এখন চলে যাচ্ছে।

তিন. ইসলামের তৃতীয় অর্থ হলো, সন্ধি, মৈত্রী, ঐক্য, বন্ধুত্ব, মেলামেশা ইত্যাদি। 'সন্ধি' বুঝানোর জন্য আরবীতে 'সালমুন' বা 'সিলমুন' শব্দও ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴿٣٥﴾

"তোমরা সাহস হারায়ো না। (বরং অবিচল থাক।) আর (বাতিলকে) সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না। তোমরাই তো বিজয়ী।"[২]

অন্য একটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً ﴿٢٠٨﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে (শান্তিতে) প্রবেশ কর।"[৩]

চার. ইসলামের চতুর্থ অর্থের দিকে আলেমগণের মনোনিবেশ খুবই কম। বিশালাকারের বৃক্ষকে আরবী ভাষায় 'সালামুন' বলা হয়। আর সিঁড়িকে বলা হয় 'সুল্লামুন'। কারণ হলো, বৃক্ষ এবং সিঁড়ি আপন উচ্চতার কারণে মানুষের হাতের নাগালের বাইরে থাকে। অতএব, শব্দমূলের প্রেক্ষিতে 'ইসলাম' শব্দের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের চেয়ে অধিক মর্যাদা

১. সূরা নিসা ৪:১২৫
২. সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৫
৩. সূরা বাকারা ২:২০৮

পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম অর্জন করতে পারেনি। আর এটিই ইসলামের মর্যাদারই দলীল যে, ইসলাম প্রত্যেক দুশমনের হাতের নাগালের বাইরে রয়েছে।

পারিভাষিক অর্থের উপর প্রথম আভিধানিক অর্থের প্রভাব

আভিধানিকভাবে ইসলাম উপর্যুক্ত চার চারটি অর্থের উপরই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, এর আভিধানিক পটভূমি থেকে একথা খুব ভালোভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামের পারিভাষিক এবং ব্যাপক অর্থের মধ্যে এ সকল আভিধানিক অর্থের প্রভাব পাওয়া যায়। কেননা, ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যেটি মানুষকে শান্তি আর নিরাপত্তার চাদরে আচ্ছাদন করে নেয়। তাদের মন-মস্তিষ্কেকে যে কোন আশংকা থেকে অভয় দেয়। ইসলামের যথাযথ আনুগত্য মানুষকে বড়ত্ব এবং মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করে। ইসলামের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ নির্দেশও এটি যে, বান্দা যেন খোদার দরবারে আত্মসমর্পণ, আনুগত্য ও সন্তুষ্টির একটি বাস্তব উদাহরণ বনে যায়। পারিভাষিক অর্থের উপর আভিধানিক অর্থ কোন কোন দৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে, তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

০১. ইসলামের পারিভাষিক অর্থের উপর শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রভাব

ইসলামে শান্তি এবং নিরাপত্তার অর্থ দু'ভাবে প্রযোজ্যঃ

ক. অকর্মক ক্রিয়া।

খ. সকর্মক ক্রিয়া।

ক. অকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে ইসলামের অর্থ

অকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে ইসলাম শব্দটির অর্থ হলো, শান্তি-নিরাপত্তা পাওয়া এবং যে কোন ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকা। সুতরাং, ইসলামের কল্যাণে যে ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখিরাতে শান্তি-নিরাপত্তা পায়, তাকে মুসলমান বলা হয়। এবং "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" থেকে উদ্দেশ্য সকল মুসলমান যে কোন শঙ্কা, ভয় এবং চিন্তা থেকে যেন রক্ষা পেয়ে যায়। কেননা, ইসলামের অনুসারীদের দুঃখ-মুসিবত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ কারণে শান্তি-নিরাপত্তার এ অর্থটি ইসলাম ধর্মেও প্রতিটি ধাপে, জ্ঞান-আমলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুরোপুরি ভাবে সংক্রমিত। এ কারণে বাস্তবিক পক্ষে ইসলামই সফলতা ও উত্তরণের পথ।

খ. সকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে ইসলামের অর্থ

সকর্মক ক্রিয়ার ভিত্তিতে, অন্যকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করাকে ইসলাম বলা হয়। এ অর্থের ভিত্তিতে, যে ব্যক্তি অন্যের শান্তি এবং নিরাপত্তার কারণ হবে, তাকে মুসলমান বলা হয়। যে ব্যক্তির মাধ্যমে মানুষ শান্তি এবং নিরাপত্তার পরশ অনুভব করবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ইরশাদ করেছেন ঃ

www.alquransms.com

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

"যে ব্যক্তির মুখ এবং হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, (অন্যান্য মুসলমানের জান, মাল এবং ইজ্জত-সম্মান নিরাপদ থাকে,) সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান।"[১]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا : لِمَنْ؟ قَالَ: للهِ وَ رَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِعَامَّتِهِمْ».

"সহযোগিতা ও সহমর্মিতার নামই হলো ধর্ম। (সাহাবারা বলেছেন,) আমরা প্রশ্ন করলাম, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ্, তাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও জনগণের জন্য।"[২]

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, মানবিক জগত থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরির আধিপত্য এবং বর্বরতার মূলোৎপাটনের মাধ্যমে শান্তি এবং নিরাপত্তার মতো গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেয়া হয়নি। কেননা, পৃথিবীকে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা দান করা ছাড়া ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ﴿٣﴾

"কাফেররা আজ তোমাদের দ্বীনের পরিপূর্ণতা দেখে নিরাশ হয়ে গেছে। তাই তোমরা তাদেরকে ভয় পেয়ো না, বরং আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, তোমাদেরকে আমার প্রদত্ত নেয়ামতে ভরপুর করে দিয়েছি। আর ধর্ম হিসেবে তোমাদের জন্য আমি ইসলামকেই মনোনীত করেছি।"[৩]

মুসলমানের সংজ্ঞায় মহান আল্লাহ্ বার বার একথা বলেছেন ঃ

১. বুখারী ১:৬
২. বুখারী : ঈমান অধ্যায়
৩. সূরা মায়িদাহ ৫:৩

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

"তাদের কোন ভয় নেই, এবং তারা চিন্তিতও না।"[১]

মহান আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের মহত্ত্ব ও মর্যাদার বিষয়টিও এভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

"স্মরণ রেখো! আল্লাহর প্রিয় দোস্তদের না কোন ভয়-ভীতির কারণ আছে, না তাঁরা হতাশাগ্রস্ত, চিন্তিত।"[২]

বান্দার অন্তর থেকে যখন আল্লাহর ভয় ব্যতীত অন্য সব ভয় বের হয়ে যায়, এবং সে দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়, তখন সে অবস্থাটির অর্থ হলো, ইসলামের প্রকৃতি তার অন্তর জগতে প্রবেশ করেছে। আল্লামা ইকবাল ইসলামের প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

هر که رمز لا اله فهمیده است
شرک را در خوف مضمر دیده است

যে লা-ইলাহার গূঢ় রহস্য বুঝেছে
সে অন্তরচোখে শিরককে দেখেছে।

মক্কা বিজয় কালে শান্তি এবং স্বাধীনতার ঘোষণা

মুসলমানরা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মক্কা বিজয় করে নিল, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাফের-মুশরিকদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং তাদেরকে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা দিয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ

"যে কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে, কিংবা বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করবে, অথবা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, নতুবা নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে, সে শান্তি এবং নিরাপত্তা পেয়ে যাবে।"[৩]

আবু সুফিয়ানের ঘরকে 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল' ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষাপট ছিল, আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এ কারণে তিনি এমনিতেই স্বীয় নিরাপত্তার গ্যারান্টি পেয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদের জন্যও নিজেদেরকে এবং নিজেদের ঘরকে রক্ষা করার একটি কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছেন।

১. সূরা বাকারা ২:৩৮
২. সূরা ইউনুস ১০:৬২
৩. সুনানে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, মিশকাত শরীফ ১:২৩, হাদীস : ২৯

রাসূলের বাণী

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কয়েকটি হাদীসে ইসলামের এ আভিধানিক অর্থকে ব্যাখ্যা করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

«الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ».

"যে ব্যক্তির মাধ্যমে অন্য মুমিনদের জান-মাল নিরাপদ থাকে সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন।"[১]

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

«لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَّ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَّ عَهْدَ لَهُ».

"আমানতের খিয়ানতকারী ব্যক্তি মুমিন নয়। আর যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না, সে যেন কোন ধর্মই মানে না।"[২]

আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ».

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার অন্য মুসলমান ভাইকে অত্যাচার করতে পারে না, এবং কোন অত্যাচারীর হাতেও তাকে তুলে দিতে পারে না।"[৩]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অন্যদের কোন দুঃখ-কষ্ট; কোন অপমান-অবমাননার কারণ হবে না, সেই মুসলমান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ».

"এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর না অত্যাচার করে, না তাকে অবমাননা করে, না ঘৃণা করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বুকের দিকে হাত রেখে তিন বার বলেন, তাকওয়া এখানে। কোন মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করাই বান্দার

[১]. নাসায়ী ২:২৩০
[২]. সুনানে বায়হাকী, মিশকাত ১:২৩, হাদীস : ৩০
[৩]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২:৪৪৬, হাদীস : ৪, ৩৯

www.alqurans.com

পাপের জন্য যথেষ্ট। এক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মান অপর মুসলমানের জন্য হারাম।"[১]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

«اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ».

"একজন মুমিন অপর মুমিনের আয়না স্বরূপ। আবার, একজন মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সে তার অপর ভাইয়ের অনিষ্টকে রুখে দেয়, তার অনুপস্থিতিতে সে তার (ধন-সম্পদের) রক্ষণাবেক্ষণ করে।"[২]

অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই মুমিন হতে পারে, যে উপর্যুক্ত হাদীসের মর্মার্থ অনুযায়ী অন্যদের জন্য শান্তি-নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের মূর্ত প্রতীক হবে। আর যদি কোন মুসলমান সুযোগ পেয়ে তার অপর কোন মুসলমান ভাইকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ না করে, তার প্রাপ্য কোন কর্মকান্ড ঘুষ ছাড়া নিষ্পত্তি না করে, তার প্রয়োজন এবং দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবৈধ ফায়দা হাসিল করে, অবৈধ উপায়ে, দুর্নীতির মাধ্যমে সমাজ দখল করে নেয়, তাহলে এ ধরণের ব্যক্তিকে কখনো মুসলমান বলা যায় না। তার এ কৃষ্ণ-আঁধারী চেহারার উপর সুলতানের তাজ শোভা পাবে না। মুসলমান সেই ব্যক্তিই হতে পারে, যার হাত-মুখের দ্বারা প্রতিটি মুসলমান; তার মা, মেয়ে, বোন এবং তার প্রতিবেশী পুরোপুরি ভাবে নিরাপদ থাকে। এ কারণে এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার কসম খেয়ে বলেছেন,

'আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়।' তিনি যখন এ বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করলেন, তখন সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন ব্যক্তি মুমিন নয়? উত্তরে তিনি বললেন, যে ব্যক্তির অত্যাচার-অপকর্ম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।

হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

«وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، قِيْلَ : مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : اَلَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

"যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার-অপকর্ম থেকে রক্ষা পায় না, সে মুসলমান নয়।"[১]

[১]. সহীহ্ মুসলিম, মিশকাত শরীফ ২:৪৪৬, হাদীস : ৪৭৪০
[২]. তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ২:৪৫১, হাদীস : ৪৭৬৬

www.alqurans.com

বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মানকে হজ্জের দিবস, হজ্জের স্থান ও বায়তুল্লাহ্ শরীফের সমমর্যাদার উপযুক্ত আখ্যায়িত করে বলেন ঃ

«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي مَقَامِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا».

"নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ অপরের জন্য এমন মর্যাদাবান ও হারাম যে, যেমন আজকের দিন (আরাফার দিন), এই স্থান এবং এই মাস সম্মানিত, হারাম ও মর্যাদাবান।"[২]

'ইসলাম' অর্থের ইতিবাচক দিক

অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন না করা, কারো জন্য চিন্তা-মুসিবতের কারণ না বনা এগুলো ইসলামের অর্থের নেতিবাচক দিক। ইসলামের অর্থের ইতিবাচক দিকগুলো হলো, যে ব্যক্তি অন্যদের জন্য মনঃপুত, উপকারী, আরাম, শান্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তার বাঁচা-মরা, চিন্তা-ফিকির ইত্যাদি সবকিছুই অন্যদের জন্য প্রশান্তি ও পরিতুষ্টির কারণ হবে। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের উপকারার্থে নিয়োজিত থাকবে, মহান আল্লাহ্ তার উপকারার্থে নিয়োজিত থাকেন। আর যে ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের যে কোন সংকট দূর করে, মহান আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তার সাজা থেকে সাজা কমিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, মহান আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।"[৩]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

[১]. মিশকাত শরীফ ২:৪৪৭, হাদীস : ৪৭৪৩
[২]. (বিদায় হজ্জের ভাষণ) বুখারী ২:৮৮৯
[৩]. মিশকাত, পৃ. ৪২২

"আল্লাহর কসম, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ সে নিজের পছন্দীয় বস্তু অন্যকে দিতে পারবে না।"[১]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

«مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ».

"যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মাংস রক্ষা করবে, (অর্থাৎ, সে নিজে গীবত করবে না, বা অন্যকে তার গীবত করা থেকে বাধা দিবে,) আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন।"[২]

অন্য একটি হাদীসে আছে ঃ

«مَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ».

"যে কোন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে তার মানহানি হওয়ার মুহূর্তে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে, মহান আল্লাহ্ তাকে তার প্রয়োজনের সময় সাহায্য করেন।"[৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেবল সেই ব্যক্তিই মুসলমান বলে পরিগণিত হয়, যার অস্তিত্ব অন্যের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হয়।

২. পারিভাষিক অর্থের উপর দ্বিতীয় আভিধানিক অর্থের প্রভাব

ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ হলো, আনুগত্য ও নতি স্বীকার। এই অর্থের ভিত্তিতে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

[১]. মিশকাত, পৃ. ৪২২
[২]. বায়হাকী: আস্ সুনানুল কুবরা, মিশকাত ২:৪৫০
[৩]. আবু দাউদ, মিশকাত ২:৪৫১, হাদীস : ৪৭৬৪

www.alqurans.com

"অথচ আসমান-যমিনের সকলই মহান আল্লাহর সামনে মাথা নত করেছে। কেউ আনুগত্য স্বীকার করে সন্তোষ, আবার কেউ নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আল্লাহর নিকটই সবাইকে যেতে হবে।"[১]

হযরত ইব্রাহীমের ঘটনার প্রবাহমানতায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾

"যখন তাঁর পরওয়ারদেগার তাঁকে বললেন, তুমি আনুগত্য স্বীকার কর। উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি বিশ্বজগতের রবের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি।"[২]

অন্য ভাষায় বলতে গেলে, প্রসিদ্ধি, ধন-সম্পদ, আত্মমর্যাদা, নেতৃত্ব ইত্যাদি অর্জনের জন্য ইসলাম ধর্ম কবুল করা নয়, বরং তা আল্লাহকে স্বীয় রব, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক মনে করার ভিত্তিতে হতে হবে।

অন্য একটি জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ ﴿١٢٥﴾

"যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর দিকে সঁপে দিয়েছে, তার চেয়ে ভালো ধার্মিক আর কে হতে পারে!"[৩]

যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজের সকল আশা-আকাঙ্খা মহান আল্লাহর আনুগত্য এবং সন্তুষ্টির অধীনে করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

"(আল্লাহর কসম,) তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাওয়া-পাওয়া সবই আমার আনীত ধর্ম অনুযায়ী হবে না।"[৪]

এর মর্মার্থ হলো, মুখে স্বীকারের সাথে সাথে অন্তরে, চিন্তায় এমনকি চাওয়া-পাওয়া সবই আনুগত্যের এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, শরীয়তের দেয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তার অন্তরে যেন সামান্যতম সংশয়ও অবশিষ্ট না থাকে। এ কারণে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

১. সূরা আলে ইমরান ৩:৮৩
২. সূরা বাকারা ২:১৩১
৩. সূরা নিসা ৪:১২৫
৪. মিশকাত, পৃ. ৩১

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"আপনার রবের কসম, এ লোকগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়। সাথে সাথে আপনার গৃহিত সিদ্ধাতের উপর নিজেদের অন্তরে কোন ধরণের সংশয় যেন না থাকে; সেটিকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে মেনে নিতে হবে।"[১]

শানে নুযুল

উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মার্থ ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্য এটির শানে নুযুল জেনে নেয়া খুবই জরুরী। এক বার এক ইহুদী এবং মুনাফিকের মধ্যে পানি বন্টন নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। উল্লেখ্য যে, এ মামলায় ইহুদী লোকটি ন্যায়ের পথে ছিল। এরা মামলাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমাধানের জন্য নিয়ে গেলেন। উভয় পক্ষের প্রমাণাদি শুনে তিনি ইহুদীর পক্ষে এবং মুনাফিকের বিপক্ষে রায় ঘোষণা করলেন। রায় ঘোষণার পর যখন উভয় পক্ষ কক্ষ থেকে বের হল, তখন মুনাফিক লোকটি ইহুদীকে বলল, এ সিদ্ধান্ত আমার মনঃপুত হয়নি। চল আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে যাই। ইহুদী বলল, যদিও তোমাদের নবীর সিদ্ধান্তের চেয়ে আর কোন উত্তম সিদ্ধান্ত হতে পারে না, কিন্তু যেহেতু আবু বকরের কাছে যেতে চাচ্ছ, তবে চল। হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা শুনে বললেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই রায় দিয়েছেন, সেখানে আবু বকরের চিন্তা করা বা নতুন কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার কি অধিকার আছে!! হযরত আবু বকরের কাছেও যখন মুনাফেকটি হতাশ হলো, সে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করল। এই কথা ভেবে যে, হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে বড়ই কঠোর, তিনি ইহুদীর বিপরীতে আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। ইহুদী রাজি হয়ে গেল। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু উভয়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রকৃত ঘটনা এবং এ মামলার ব্যাপারে রাসূলের পেশকৃত ডিক্রীর কথা শুনে বললেন, কিছুক্ষণ বস, আমি এখনি এসে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিচ্ছি। একথা বলে তিনি ভিতর থেকে একটি ঝকঝকে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আসলেন। এসেই তিনি মুনাফিকের শিরশ্চেদ করে দিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি কালেমা মুখে রেখে রাসূলের

১. সূরা নিসা ৪:৬৫

www.alqurans.com

ফয়সালার উপর আস্থা রাখবে না, আর ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট ফয়সালা চাইবে, তবে ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট সে ব্যক্তির ফায়সালা এটিই। এ ঘটনার খবর মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে মুনাফিকরা এটিকে খুবই ন্যক্কারজনক ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করল। তারা প্রমাণ করতে চাইল যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ খবর জানলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমরের তলোয়ার দ্বারা মুসলমান হত্যা হতে পারে না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এটিতে কিয়ামত পর্যন্ত এ খোদায়ী বিধানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে নেবে না এবং যে ব্যক্তির অন্তরে তাঁর বাণী সম্পর্কে সব ধরণের সন্দেহ-সংশয় খতম হয়ে যাবে না, সেই ব্যক্তি মুসলমান হতেই পারবে না। এ কারণে এ হত্যা কোন মুসলমানকে নয়, বরং একজন মুনাফিককে।

সারকথা হলো, ইসলাম তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে মান্যতা ও আনুগত্যের সেই উন্নত মাপকাঠিকেই কামনা করে, মানুষ তাদের গর্দানকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে এভাবে ঝুঁকবে, যেন এরপর তার ধ্যান-ধারণায়, চলাফেরায় কোন ধরণের সংশয় এবং সন্দেহের প্রভাব দেখা না যায়। মান্যতা এবং আনুগত্যের এ মাপকাঠি হলো, হযরত ইব্রাহীমের গড়া মাপকাঠি। আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য কবুল করার পর নমরুদের অগ্নিকুন্ডে ঝাপিয়ে পড়তে তিনি সামান্যতমও উদ্বিগ্ন হন নি। এ কারণে আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন ঃ

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی

ভয়-ভীতি ছাড়াই ইশ্‌ক
নমরুদের অগ্নিকুন্ডে ঝাপিয়ে পড়েছে।
জ্ঞান অচল হয়ে পড়েছে
প্রাণ এখন চলে যাচ্ছে।

যখন বুদ্ধি কোন বিষয়কে মেনে নেয়, তখন সে চিন্তা-ভাবনা করেই পা ফেলতে থাকে। সে সর্বদা লাভ-ক্ষতির কথা প্রথমে চিন্তা করে। এর বিপরীতে ইশ্‌ক্ বা আবেগ যখন আনুগত্যেও সমুদ্রে ডুব দেয়, তখন সে লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তাই করে না। তখন সে লাভের আশা রাখে না; ক্ষতির ধার ধাওে না। আশেকের অবস্থা এমন হয় যে, সে কিশতী জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে ফিওে যাওয়ার সব সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায়। এ কারণে আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

বুদ্ধির সমালোচনা করার সময় নেই।
আমলের ভিত্তি ইশকের উপর রাখ।

৩. পারিভাষিক অর্থের উপর তৃতীয় আভিধানিক অর্থের প্রভাব

শব্দতত্ত্ববিদগণের দৃষ্টিতে 'সালমুন' শব্দমূলের অন্যতম একটি অর্থ সন্ধি, ঐক্য ইত্যাদিও রয়েছে। এ শব্দমূল থেকে ইসলামের শব্দাবলী পবিত্র কোরআনে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আনফালে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

"যদি এসব লোকেরা সন্ধি করতে চায়, তবে তোমরাও সন্ধির দিকে ঝুঁক। আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখ।"[১]

এ অর্থের ভিত্তিতে সন্ত্রাস-দুর্নীতি থেকে বেঁচে থাকা এবং সন্ধির পন্থা অবলম্বন করার নাম ইসলাম, যেটি সর্বদা একতা ও সন্ধিকে উৎসাহিত করে। বাস্তব কথা হলো, ইসলাম তার সকল প্রকৃতি, জ্ঞান এবং মূলনীতির ভিত্তিতে একটি সন্ধি প্রিয় ধর্ম। ইসলাম সর্বদা একতা, সমঝোতাকে শান্তি-নিরাপত্তার খাতিরে সাহস যুগিয়েছে। কিন্তু, ইসলাম কেবল তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে- একথা বলা ইসলামের প্রকৃতি ও ইসলামী চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অজ্ঞ থাকার ফলাফল।

যুদ্ধাবস্থায়ও সন্ধি প্রিয়তার নমুনা

ইসলামের শান্তি ও সন্ধি প্রিয়তার ধারণা সম্পর্কে সঠিক ভাবে অবগতি লাভ করার জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ পরিসরে ইসলামী ধারণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগের সম্পর্ক যুদ্ধাবস্থার সাথে। দ্বিতীয়টির সম্পর্ক সাধারণ অবস্থায়। কোন জাতির আসল এবং প্রকৃত জাতিসত্ত্বার মুখাবয়ব যুদ্ধাবস্থায় ভেসে উঠতে পারে। ইসলাম যুদ্ধাবস্থায়ও তার অনুসারীদেরকে যথাসম্ভব সন্ধি প্রিয় হবার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন, সূরা আনফালের উদ্ধৃতিতে মহান আল্লাহর এ নির্দেশটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, যদি দুশমন যুদ্ধাবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব পেশ

[১]. সূরা আনফাল ৯:৬১

www.alquransms.com

করে, তবে এটিকে সাথে সাথেই কবুল করে নাও। আর দুশমনের নিয়্যতের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর। সূরা নিসায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟ وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴿٩٤﴾

"হে ঈমানদারগণ ! যখনই তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, তখন খুব চিন্তা-ভাবনা করে বের হও। আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম করবে, তাকে একথা বলো না যে, তুমি তো মুমিন নও।"[১]

খোদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বাহিনীকে জিহাদের উদ্দেশে পাঠাতেন, তখন তাদেরকে এ বলে সর্বশেষ নির্দেশ দিতেন যে,

«وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدًا».

"যখন তোমরা তোমাদের শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করো। তিনটি থেকে যে কোন একটি কবুল করলে তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করে দিবে। এক. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। দুই. যদি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদেরকে সন্ধিতে আবদ্ধ করে 'কর' আদায়ের শর্ত গ্রহণ করার প্রস্তাব দাও। তিন. যদি তারা এ দু'টি প্রস্তাব কবুল না করে, তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দাও।"[২]

অন্যত্র তিনি বলেন,

«وَإِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوْا أَحَدًا».

[১]. সূরা নিসা ৪:৯৪

[২]. মুসলিম শরীফ, জিহাদ অধ্যায়; মিশকাত শরীফ ২:২৩৯, হাদীস : ৩৭৫১

যদি তোমরা কোন জনপদে কোন মসজিদ দেখতে পাও, অথবা আযানের আওয়াজ শুনতে পাও, তখন তোমরা কারো সাথে যুদ্ধ করো না।[১]

খোদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তামাম যিন্দেগীতে এ আমলই করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি সর্বদা শত্রুদের নিকট সন্ধির দাওয়াত পেশ করতেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও তিনি এটি অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতেন।

আমর বিন আবদুদকে ইসলামের দাওয়াত

খন্দক যুদ্ধে যখন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ও আমর বিন আবদুদ মুখোমুখি হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মতো হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু তার নিকট এ তিনটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমর তৃতীয় পন্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থা কবুল করল না।

৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওমরা করার উদ্দেশে মক্কা পৌঁছলেন, তখন ইসলামের শত্রুরা মুসলিম বাহিনীকে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে বাঁধা দেয়। সেখানে সকল সাহাবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁদের নিকট থেকে শাহাদতের বাইআতও গ্রহণ করে নিয়েছেন। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যদি যুদ্ধ সংঘটিত হতো, তবে বিজয় মুসলমানরাই ছিনিয়ে নিতে পারত। কিন্তু, তিনি শত্রুদের প্রস্তাবে সন্ধির পথ বেছে নিলেন। সেখানে এমন কিছু শর্তও তিনি মেনে নিয়েছেন, যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবীর মত ছিল না।

সন্ধির সেই যুগে দূর-দূরান্তেও রাজা-বাদশাদের নামে তাবলীগী এবং সন্ধিভিত্তিক চিঠি-পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে যেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল, তার সাথে তার মর্জির শর্তের উপর সন্ধি করে নেয়া হয়েছে।

এ সকল উদ্ধৃতির মাধ্যমে একথা ভালোভাবে প্রমাণ হয়ে যায়া যে, ইসলাম সন্ধি ও একতার ধর্ম। যুদ্ধ বা বাধ্য করার ধর্ম কখনো নয়।

"هَلاَّ شَقَقْتَ قَلْبَهُ" কালেমা উচ্চারণকারীকে হত্যা করা জায়েয নেই

হাদীসে এমন জোর নির্দেশও পাওয়া যায় যে, যদি কোন কাফের মাথার উপর নাঙ্গা তলোয়ার উঠে আছে দেখেও যদি সন্ধির চুক্তি কবুল করে, অর্থাৎ, কালেমায়ে তায়্যিবা পড়ে, তবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা জরুরী। একবার জনৈক সাহাবি ইসলামের এক শত্রুকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে সে কালেমা

[১]. মিশকাত শরীফ ২:২৪১, হাদীস : ৩৭৫৭

পড়ে নেয়। কিন্তু সাহাবী তার কালেমার পরোয়া না করে তাকে হত্যা করে ফেললেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদটি জানতে পেরে সাহাবীটিকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সেই হত্যার নিন্দা করেছেন। উত্তরে সাহাবী যখন একথা বললেন, সে কেবল জান বাচানোর জন্য কালেমা পড়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

«هَلاَّ شَقَقْتَ قَلْبَهُ».

"তুমি কি তার বুক চিরে দেখে নিয়েছিলে?"[১]

পরবর্তীতে সে হত্যা হওয়া ব্যক্তিকে মুসলমান মেনে নিয়ে সে হত্যাকে "কতলে খত্বা" বা "ভুল ক্রমে হত্যা" - এর মর্যাদা দেয়া হয় এবং হত্যা হওয়া ব্যক্তির অভিভাবককে "পূর্ণ রক্তমূল্য" আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বিধানের অকার্যকরিতা ও এর প্রেক্ষাপট

এটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে খোদ পবিত্র কোরআনে একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এ বিধানটি জারি না হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। যদি তার সঠিক ভাব বুঝে নেওয়া যায়, তবে ইসলামের সন্ধি প্রিয়তার ব্যাপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। সূরা মুহাম্মদে উল্লেখ আছে ঃ

فَلَا تَهِنُوا۟ وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾

"তোমরা দুর্বল হয়ো না, শত্রুদেরকে সন্ধির প্রতি আহ্বান করো না। তোমরাই তো বিজয়ী। আর আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনো তোমাদের আমলকে নিরর্থক কিংবা বিফল যেতে দিবেন না।"[২]

এ আয়াত থেকে যদি একথা বুঝে নেয়া হয় যে, ইসলাম শত্রুদের সাথে সন্ধির পথ একচেটিয়া ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে, তবে এটি হবে মারাত্মক ভুল। এখানে মূলতঃ ইসলাম এবং কুফরের পারস্পরিক এককের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। মুসলমানদেরকে একথার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ইসলামের শত্রুদের সাথে কখনো এ পর্যায়ের সন্ধি করবে না, যেটি ইসলামের আত্মরক্ষাত্মক পজিশনকে ভেঙ্গে দেয়। কুফর এবং ইসলামের মধ্যে কোন ভাবেই সংমিশ্রণ হতে পারে না। কখনো যেন এমন না হয় যে, তোমরা নিজের অবস্থান থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে হক-বাতিলের

---

[১]. আবু দাউদ ১:৩৫৬
[২]. সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৩৫

www.alqurans.com

ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকে খুঁইয়ে বসবে এবং শত্রুদের প্রতারণার শিকার হবে। এর বিপরীতে পবিত্র কোরআন এ নির্দেশ দিচ্ছে যে, আঁচলকে কাঁটা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাঁট। নিজেকে কুফর এবং শিরকের মধ্যে মিশে যেতে দিও না। স্বরণ রেখো, যেখানে কুফরী রয়েছে, সেখানে ইসলাম আসতে পারে না। আর যেখানে ইসলাম আছে, সেখানে কুফরী প্রবেশ করতে পারে না। যেমন, আল্লামা ইকবাল বলেছেন ঃ

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

লড়াই চলছে অনাদিকাল হতে
আজ পর্যন্ত সময়ের
মুহাম্মদী আলোর সাথে
আবু লাহাবী শয়তানির।

পবিত্র কোরআন "ভালো কাজে সহায়তা" ও "কুফরীকে সহযোগিতা না করা" - এর একটি নতুন ধারণা পেশ করছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ﴿٢﴾

"ভালো কাজ এবং তাকওয়াতে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো। গুনাহ এবং সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে সহযোগিতা করো না।"[১]

এ ধরণের সহযোগিতা হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য না করে হতে পারে না বরং এ সহযোগিতা হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তিতেই হতে পারে। এ কারণে সূরা নিসায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

"মুমিনরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর কাফেররা লড়াই করে শয়তান-ভুতের রাস্তায়। অতএব, তোমরা শয়তানের সহযোগিদের সাথে লড়াই কর। কেননা, শয়তানের ফন্দি অতি দুর্বল।"[২]

---

[১]. সূরা মায়িদাহ ৫:২
[২]. সূরা নিসা ৪:৭৬

www.alqurans.com

সন্ধি এবং মুনাফেকীর মধ্যে পার্থক্য

প্রকাশ থাকে যে, সন্ধি এবং মুনাফেকী দু'টি পৃথক এবং পরস্পর বিপরীতমুখী পন্থা। ইসলাম যে সন্ধির শিক্ষা দেয়, তার অর্থ হলো, হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা এবং পারস্পরিক সক্রিয়তাকে উপেক্ষা করা যাবে না, সাথে সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী হককে হক এবং বাতিলকে বাতিলের প্রাপ্য ফায়সালা জারি রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের সন্ধির ধারণা হলো, আমরা অপকর্মকে অপকর্ম জেনেও এবং বাতিলকে বাতিল জেনেও সেগুলোর সাথে সহযোগিতা এবং একযোগে কাজ করার ধারাবাহিকতা জারি রাখি। তার উপর বলা হয় যে, আমরা সন্ধি মোতাবেক চলছি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুশি রাখা দরকার। প্রত্যেক ব্যক্তির অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে চাই। আমরা ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিকতা ভঙ্গ করাকে ভয় করি। দুনিয়াবী রীতি-নীতি এবং 'দুনিয়া বাসী কি বলবে' এর ধারণায় আমাদের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে আমরা বাতিল এবং প্রতারণার প্রতিটি বাস্তবতার সাথে আমলী সহযোগিতা জারি রেখেছি। মিথ্যুককে মিথ্যুক এবং প্রতারককে প্রতারক বলছি না, কারণ আমাদের অন্তরে তাদের অসন্তুষ্টিকে জায়গা দেয়ার সাহস আমাদের নেই। একজন প্রতারক ও ধোঁকাবাজকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি না। আমাদের জেনে রাখা উচিত, এ ধরণের আচরণ অতি নিকৃষ্টতম মুনাফেকী। অথচ আমরা দোয়া কুনুতে আল্লাহর সাথে এ ওয়াদাটি প্রতি রাতে করি ঃ

وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ.

"আমরা আপনার নাফরমানীতে লিপ্ত লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।"

আর পবিত্র কোরআন বলছে, যদি ভালো কাজ মন্দ কাজের রাস্তা বন্ধ করতে না পারে এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে দোস্তিয়ানা সম্পর্ক বজায় রাখে, তখন এর পরিণাম হয় অত্যন্ত খারাপ; নেকী এবং ভালো কাজের সকল উৎস মূল থেকে ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন, সূরা হজ্জে জিহাদের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿٤٠﴾

"যদি মহান আল্লাহ্ বিশেষ কিছু মানুষের মাধ্যমে অন্য লোকদেরকে শাসন করার ব্যবস্থা না করতেন, তবে পাদ্রীদের মন্দির, খ্রীষ্টানদের গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মুসলমানদের মসজিদ; যেখানে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্‌র করা হয়, সবই ধ্বংস হয়ে যেত।"[১]

ভালো-মন্দের মধ্যে বৈপরিত্য

মহান আল্লাহ্ ভালো ও মন্দ, উভয়ের মধ্যে বৈপরিত্যের একটি নিয়ম নির্ধারণ করে, তাতে মানবতার অস্তিত্ব টিকে থাকার রহস্য নিহিত রেখেছেন। মহান আল্লাহ্ যদি এ বৈপরিত্য কায়েম না করতেন, তবে আজকের দুনিয়া ভিন্ন একটি রূপই পরিগ্রহ করত। পৃথিবীতে না কোন নেকীর চর্চা হতো, না ভালো কাজের ধারক-বাহক অবশিষ্ট থাকত। আজকের পৃথিবীতে না তাকওয়া থাকত, না তাকওয়াবানদের কোন অস্তিত্ব থাকত। মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে মন্দের মোকাবিলা করার জন্য সাহসী মানুষ ঠিক একই সমাজ থেকে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি ফেরআওনের অত্যাচারের কালো হাত ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে, তার নির্যাতনের কালো থাবা রুখে দেয়ার জন্যে সেই সমাজ থেকে মুসা আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বাহাদুর বীর পুরুষ সৃষ্টি করার নিয়ম জারি রয়েছে। এভাবে ভালো এবং মন্দ উভয়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে মন্দ তার আপন স্থান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। এ কারণে জিহাদের ঘোষণা উচ্চারিত হয়ে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ﴿٧٤﴾

"যারা পার্থিব জীবনকে বিক্রি করে আখিরাত কিনে নেয়, তারা যেন তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাহে জিহাদ করে।"[২]

এ প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে আত্মসম্ভ্রমবোধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

---

১. সূরা হজ্ব ২২:৪০
২. সূরা নিসা ৪:৭৪

www.alqurans.com

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর রাহে অসহায় নর-নারী ও শিশুদেরকে সহাযোগিতা করার খাতিরে লড়াই করছ না। যারা এই বলে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে এ জালিম অধিবাসীদের শহর থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে যান। আর খোদ আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন।"[১]

যখন কোন একটি জনগোষ্ঠী নির্যাতনের কবলে পিষ্ঠ হচ্ছে, তাদের জান-মাল, ধন-সম্পদ গুটি কয়েক ধনকুবের ও পুঁজিপতিদের হাতে বন্দি, নারী-শিশু এবং সমাজের দুর্বল-অসহায় মানুষেরা আল্লাহর দরবারে জুলুমের তাড়নায় আহাজারী করছে, তাদের উপর অতিমাত্রায় জুলুম-অত্যাচার করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, সমাজের এ নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষদেরকে মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আরাম-আয়েশ, ঘুম-প্রশান্তি সবই হারাম হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সূরা বাকারাতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟

فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"তোমরা তাদের (কাফেরদের) সাথে সন্ত্রাস-নির্যাতন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ; দেশে আল্লাহর দ্বীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে থাক। এতে তারা যদি সন্ত্রাস-নির্যাতনের পথ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন অত্যাচারী ব্যতীত অন্য করো উপর সীমালঙ্ঘন করা উচিত হবে না।"[২]

অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন এখানে দু'টি মূলনীতি বর্ণনা করেছে। এক. যদি কোন সমাজে জুলুম- নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালানো হয়, তবে সেই নির্যাতন-নিপীড়নকে রুখে দিয়ে সমাজে শান্তি এবং নিরাপত্তার পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য জরুরী যে, জুলুমের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। দুই. আর যদি সমাজ সব ধরণের সন্ত্রাস-নির্যাতন থেকে রেহায় পেয়ে যায়, তবে আমরা নিজেরাও শান্তিতে থাকব এবং অপরকেও শান্তিতে থাকতে দেব।

১. সূরা নিসা ৪:৭৫
২. সূরা বাকারা ২:১৯৩

আকাবার দ্বিতীয় বায়আত সম্পর্কে হযরত সা'আদ বিন উবাদা রাদিআল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মদীনাবাসীর বড় একটি দল হজ্জের মৌসুমে মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। দলের সকলেই বায়আতের জন্য নিজ নিজ হাত রাসূলের নিকট বাড়িয়ে দিলেন। মদীনার আনসারী সাহাবীগণের বায়আত শেষ না হতেই হযরত সাআদ বিন উবাদা আনসারী খাযরযী রাদিআল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আনসার! খুব ভালোভাবে চিন্তা করো যে, তোমরা কোন বিষয়ে বায়আত গ্রহণ করছো ।" অতপর তিনি বললেন ঃ

«إِنَّكُمْ تُبَايِعُوْنَهُ عَلَى حَرْبِ الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ مِنَ النَّاسِ».

"তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বায়াআত গ্রহণ করছো।"[১]

অর্থাৎ, ইসলামের বায়আত করার অর্থ এই নয় যে, কেবল নামায-রোযার বায়আত করা; কেবল নিজেকে রক্ষা করা বা নিরাপদে রাখার নাম নয়। বরং, প্রকৃত পক্ষে ইসলাম হলো, যে কোন অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নাম। কবি ইকবাল বলেছেন ঃ

یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

"এ শাহাদাত হলো প্রীতি-ভালোবাসার ঘরে পা রাখা,
মানুষ মনে করে মুসলমান হওয়া বড় সহজ ব্যাপার।"

ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে, নাকি কীর্তির জোরে

ইসলামের শান্তি-নিরাপত্তার বিধানের ব্যাপারে প্রাচ্যবিশারদদের উত্থাপিত প্রশ্নটি এখানে উল্লেখ করলে অনর্থক হবে না। প্রশ্নটি হলো, "ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে।" তবে এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হলো, ইউরোপ ভীতুদের দেয়া এ প্রশ্নের উত্তর শুনে। তারা বলেছে, ইসলাম কেবল কীর্তির জোরে প্রসারিত হয়েছে। এসব লোকেরা মুসলমানদের হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে ইসলামকে কেবল দাওয়াতে তাবলীগ এবং কীর্তির উৎস প্রমাণ করে ইসলামী ভাবধারাকে সরাসরি অস্বীকার করেছে। 'ইসলামের সঠিক উত্তর ইসলামের দুশমনদেরকে আমরা পৌঁছাতে পারিনি'। তাদের এ ধরণের আত্মসমর্পণমূলক উত্তর প্রদান, তাদের চৈন্তিক

১. সীরাতে ইবনে হিশাম ১:৪৪৬

www.alqurans.com

ভীতির বহিঃপ্রকাশ। আসল কথা হলো, মুসলমানরা শক্তির অধিকারী হলে, ইউরোপ কি ভাবছে বা ভাবছে না, প্রাচ্যবিশারদরা কি বলছে, তার কোন পরোয়া করতাম না আমরা। কিন্তু, ইসলামের ধারক-বাহকদের সাহসে, আবেগে ভাটা পড়ে গেলে হাজার রাতেও তাদের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে না।

প্রকৃত কথা হলো, ইসলাম প্রয়োজনানুসারে তলোয়ার এবং দাওয়াতী কীর্তি উভয়ের সমন্বিত শক্তির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। ইসলামে একদিকে যেমন দাওয়াতী কার্যক্রমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান নির্মাণ করা হয়েছে, তেমনি ভাবে অন্যদিকে অপকর্ম ও অপরাধ দমনের জন্য তলোয়ার হাতে তুলে নেয়ার জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ বিধানটি নামায-রোযা এবং অন্যান্য পাঁচ রুকনের মতো নয়, বরং প্রয়োজনে সেটি এগুলো থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যদি তলোয়ার হাতে নেয়া ইসলামের উদ্দেশ্য না হতো, বরং, কেবল মাত্র দাওয়াতী কৌশলই ইসলামের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হতো, তবে কুফরী বিশ্বের সাথে ইসলামের এত দীর্ঘ দ্বন্দ্বের কী প্রয়োজন ছিল? যদি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল 'আল্লাহ্ আল্লাহ্ করা' -এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ আবদ্ধ রুমে বসে তাসবীহ্ পড়তে থাকতেন। বাইরের জগতের খোঁজ-খবর নেয়া এবং সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বা তাঁদের কি প্রয়োজন ছিল? এর বিপরীতে রাসূলের প্রাণ প্রিয় সাহাবাগণ ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য নিজেদের জান-মাল কোরবান করে দিয়েছেন, মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, প্রিয়জন-আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। নিজের পুত্র-সন্তাদেরকে শহীদ করাতে হয়েছে। খোদ রাসূলের পবিত্র দেহ তায়েফের ময়দানে রক্তাক্ত হয়েছে। উহুদের মাঠে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছে। যদি কেবল নামায-রোযা এবং হজ্জ-যাকাতের সাধারণ এলান এবং নির্দেশ যথেষ্ট হতো, তবে আত্মোৎসর্গ করা ও বিভিন্ন জালা-যন্ত্রণা সহ্য করার কি প্রয়োজন ছিল? কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, ইসলাম একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। ইসলাম সর্ব প্রথম দাওয়াতে তাবলীগের কল্যাণে মন্দের মূলোৎপাটন করে। যদি এতে অপরাধ দমন সম্ভব না হয়, তবে তলোয়ারের জোরে সন্ত্রাস-নির্যাতন বন্ধের চেষ্টা করে। ইসলামের এ আন্দোলনী প্রক্রিয়া একদিকে যেমন প্রশ্নাতীত, তেমনি ভাবে পরিচিতও। বিশ্বের কোন আন্দোলন তলোয়ার এবং কীর্তির অনস্বীকার্য নিয়মকে উপেক্ষা করে সফলতার মুখ দেখতে পারে না। একদিকে তলোয়ার যেমন ইসলাম থেকে পৃথক নয়, তেমনি ভাবে মানুষের কীর্তি-সফলতাও তলোয়ারের সম্পৃক্ততা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। যে কীর্তি হকের তলোয়ার ছাড়াই অর্জিত হয়,

তা ইসলামের দৃষ্টিতে ভীরুতা, কাপুরুষতা। আর যে তলোয়ার হকের কীর্তিতে ব্যবহৃত হয় না, সেটি জুলুম, অত্যাচার। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কীর্তি এবং তলোয়ার উভয়ের উপর সমভাবে গুরুত্বারোপ করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন ঃ

«إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ».

"নিশ্চয়ই তলোয়ারের ছায়াতলে জান্নাতের ঠিকানা।"[১]

ইসলাম এমন একটি আন্দোলন বাস্তবায়ন করতে চায়, যেটি হবে সার্বজনীন, প্রতিটি স্তরে তার প্রভাব সংক্রমিত হবে। এর ফলশ্রুতিতে 'শাসন ক্ষমতা' বাতিলের হাত থেকে হকের হাতে এসে যাবে এবং মানবিক অধিকারের উপর থেকে বাতিলের ভাড়াটে কর্তৃত্ব নস্যাৎ হয়ে যাবে। ইসলাম বাতিলের অধীনস্থ জীবনকে সমর্থন করে না বরং জালিমকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে অত্যাচারকে চিরতরে নির্মুল করার জোর নির্দেশ দেয়। এর ভিত্তিতে ইসলাম কর্ম কৌশল অবলম্বন করার শিক্ষাও দিয়েছে। জুলুমের মূলোৎপাটনের জন্য নিজের তলোয়ারও কোষ থেকে বের করেছে। এ তলোয়ার, জালিমদের জুলুম, কাফেরদের নির্যাতনের ধারাবাহিকতা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং শাসন ক্ষমতা বাতিলের ধারক-বাহকদের নিকট থেকে হক পন্থীদের দখলে না আসা পর্যন্ত কোষমুক্ত ছিল। একবার যখন ইসলামী শাসন কায়েম হয়ে গেছে, এরপর কাফেরদেরকে মুসলমান বানানোর জন্য ইসলাম তলোয়ার ব্যবহার করেনি। ইসলাম অত্যাচার, সন্ত্রাস, নিপীড়ন ও নির্যাতনকে তলোয়ারের জোরে ধুলিস্যাৎ করেছে, কিন্তু কাফেরদের অন্তরকে জয় করেছে কীর্তির মর্যাদার বদৌলতে। মোটকথা হলো, ইসলামের সন্ধি এবং একতার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন জুলুম-নির্যাতনের অবকাশ যেমন নেই, তেমনি ভাবে ভীরুতা ও কাপুরুষতার স্থানও নেই।

০৪. ইসলামের পারিভাষিক অর্থে চতুর্থ আভিধানিক অর্থের প্রভাব

'سَلْمٌ' শব্দমূল থেকেই 'سَلَمٌ' এবং 'سَلاَمٌ' শব্দদ্বয় গঠিত হয়েছে। শব্দ দু'টির অর্থ হলো 'বিশাল বৃক্ষ'। একই ভাবে যে বস্তুর মাধ্যমে মানুষ কোন উঁচু স্থানে পৌঁছে, সেটিকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'سُلَّمٌ' বাংলায় 'সিঁড়ি'। এ অর্থের ভিত্তিতে ইসলাম মহত্ত্ব এবং বড়ত্বের প্রতীকও, সাথে সাথে মহত্ত্ব ও বড়ত্বের শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছার মাধ্যমও। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অপমান-লাঞ্ছনার শিকার হবে সে কখনো মুসলমান হতে পারবে না। ইসলামের নিয়তি হলো, ইজ্জত এবং সফলতা। যে ব্যক্তি প্রত্যেকের সামনে নিজেকে খাটো করে উপস্থাপন করার মাধ্যমে মানবতার প্রবঞ্চনা ও অপদস্থতার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে, সে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার উপযুক্ত নয়।

---

[১]. মিশকাত শরীফ, জিহাদ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৩ (দিল্লী মুদ্রণ)

www.alqurans.com

তার বিপরীতে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সামনে মাথা নত করে মানবতাকে গর্বিত করবে এবং এ নতি স্বীকারের মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখিরাতের ইজ্জত-সম্মান একত্রিত করে দেবে, সেই মুসলমান।

মহান আল্লাহ্ এমন এক সত্তার অধিকারী যে, মানুষ তাঁর সামনে যতই নতি স্বীকার করে, ততই তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে যতই অহঙ্কার আর বড়াই করে, ততই লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়। যেমন, পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলছেন,

أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

"তারা কি তাদের (অপরের) সামনে মর্যাদাবান হতে চায় ? (মনে রেখো !) সকল ইজ্জত-সম্মান রয়েছে আল্লাহর সামনেই।"[১]

কাফেরদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলছেন ঃ

وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾

"আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"[২]

উপর্যুক্ত সম্মান হাসিলের তরীকা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

«مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ».

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সামনে বিনয়ী হয়, মাথা নত করে, মহান আল্লাহ্ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তখন সে নিজের কাছে তুচ্ছ কিন্তু মানুষের নিকট মহৎ বলে বিবেচিত হয়। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে, মহান আল্লাহ্ তাকে অপদস্থ করেন। তখন সে মানুষের নিকট একজন তুচ্ছ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, আর সে নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। সে মানুষের নিকট এতই নিম্নমানের হয় যে, মানুষ তাকে কুকুর-শুকর থেকেও তুচ্ছ মনে করে।"[৩]

---

১. সূরা নিসা ৪:১৩৯
২. সূরা বাকারা ২:৯০
৩. মিশকাত শরীফ ২:৪৭৫, হাদীস: ৪৮৯০

যাই হোক, বাস্তব কথা হলো, যদি কেউ আল্লাহর সামনে বিনয়, নম্রতা ও বশ্যতা প্রদর্শন করে, সে সম্মানী ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হয় লাঞ্ছিত-অপমানিত হয় না। অপর পক্ষে, আল্লাহর দরবারের সাথে অসম্মান-অহঙ্কার-বড়ত্ব প্রদর্শনকারী ব্যক্তি সর্বদা প্রবঞ্চনার শিকার হয়। আল্লামা ইকবাল এ ভাবটিকে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

مٹادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

তুমি যদি সম্মান পেতে চাও,
তবে বিলীন করে দাও নিজেকে।
বীজ মাটিতে মিশে যাওয়ার পরেই,
সুন্দর একটি ফুল ফোটাতে পারে।

একই ভাবে, এটিও একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, গাছে যত বেশী ফল জন্মায়, গাছটি তত বেশী নত হয়, নিম্নমুখী হয়। তাই একজন মুমিনের ইজ্জত-সম্মান, মহান আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম নতি স্বীকার, বশ্যতা ও নম্রতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

WWW.ALQURANS.COM

সারকথা

এসব আলোচনার মোদ্দা কথা হলো, ইসলাম হলো এমন একটি ধর্ম, যেটি বান্দাকে আল্লাহর সাথে আনুগত্য ও বশ্যতার এমন দৃঢ় সম্পর্ক নির্মাণ করে দেয়, যার ফলে তার নিকট খোদার সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোন কিছুর চিন্তা থাকে না। আল্লাহর সাথে এ ধরণের সম্পর্ক, তাকে শান্তি-নিরাপত্তা-আরাম-আয়েশ প্রভৃতি দৌলতের মালিক বানিয়ে দেয়। ইসলাম তার চরিত্রে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, তার চরিত্র দিন দিন পরিবর্তন হতে থাকে। তার অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তার কীর্তি এবং আকীদায় এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করে যে, পুরো পৃথিবী অপকর্ম-বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়ে গেলেও, সে কালের প্রভাবে বিন্দু পরিমাণও প্রভাবিত হয় না। তার জান-মালের কোরবানী দিতে হলেও, সে কখনো বাতিলের সাথে একমত পোষণ করে না। এভাবেই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতার এ ধরণের সম্পর্কের কল্যাণে বান্দা দুনিয়া এবং আখিরাতের নেয়ামত রাজিতে ভরপুর হয়ে যাবে। সে আল্লাহর সত্ত্বায় ডুব খেয়ে উভয় জাহানের সম্মান হাসিল করে নিবে।

অতএব, যদি খোদার সত্ত্বার উপর তার পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল আর ভরসা থাকে, তাঁর সাথে প্রেমের সম্পর্ক পয়দা হয়ে যায় এবং আল্লাহর বিধানাবলী যথাযথ ভাবে পালনের ব্যাপারে সে সচেতন থাকে, তবে তাকে প্রকৃত অর্থে মুসলমান বলা যাবে।